তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. সুরাইয়া পারভীন
মোস্তাফা জব্বার
মুনির হাসান
লুৎফুর রহমান
মোঃ মুনাব্বির হোসেন

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৫
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। আশা করি, নবম ও দশম শ্রেণির **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জন, এ বিষয়ে আগ্রহী এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ	১
দ্বিতীয়	কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা	১৫
তৃতীয়	ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি	৪২
চতুর্থ	আমার লেখালেখি ও হিসাব	৫২
পঞ্চম	মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স	৬৪
ষষ্ঠ	প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	১১০

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ

এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-সার্ভিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে ই-কমার্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সামাজিক যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিনোদনের ক্ষেত্রে আইসিটির ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি পোস্টার ডিজাইন করতে পারব।

একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিগত শতাব্দীতে সম্পদের যে ধারণা ছিল, একুশ শতকে এসে সেটি পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পৃথিবীর সবাই মেনে নিয়েছে যে, একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যার অর্থ কৃষি, খনিজসম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়, শিল্প কিংবা বাণিজ্যও নয়– এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারে, জ্ঞান ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর সম্পদের এই নতুন ধারণাটি সারা পৃথিবীতেই মানুষের চিন্তাভাবনার জগৎ পাল্টে দিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ এখন একুশ শতকের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

আমরা সবাই অনুভব করতে পারছি একুশ শতকের পৃথিবীটা আসলে জ্ঞানভিত্তিক একটা অর্থনীতির ওপর দাঁড়াতে শুরু করছে। একুশ শতকে এসে আমরা আরও দুটি বিষয় শুরু করেছি– যার একটি হচ্ছে Globalization, অন্যটি হচ্ছে Internationalization। এই দুটি বিষয় ত্বরান্বিত হওয়ার পেছনের কারণটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। যেকোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা বিশ্বায়নের কারণে নিজের দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটি বোঝার জন্যে আমরা আমাদের বাংলাদেশের উদাহরণটিই নিতে পারি। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে– তাঁরা যে যেখানে আছে সেই অংশটুকুই বাংলাদেশ। এক অর্থে বাংলাদেশের সীমানা ছড়িয়ে গেছে! আবার বাংলাদেশের অধিবাসী হয়েও তারা পৃথিবীর অন্য দেশের নাগরিক হয়ে বেঁচে আছে, আন্তর্জাতিকতা এখন এই নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম।

আমরা জানি, পৃথিবীর মানুষকে এক সময় বেঁচে থাকার জন্যে পুরোপুরি প্রকৃতির অনুকম্পার ওপর নির্ভর করতে হতো। মানুষ বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পৃথিবীর যে সকল জাতি শিল্প বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, এক সময় তারাই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একুশ শতকে যখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে, তখন আবার সেই একই ব্যাপার ঘটছে। যারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নেবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এই নতুন বিপ্লবে অংশ নিতে হলে বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে সেটি আমরা অনুভব করতে পারি। যদি আমরা বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো দেখতে চাই তাহলে সেগুলো হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানে পারদর্শিতা, বিশ্লেষণী চিন্তন দক্ষতা (critical thinking), সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা।

আইসিটি প্রতিযোগিতা

সত্যি কথা বলতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা (skill) হিসেবে খুব দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা থাকলেই একজন এটি ব্যবহার করে তার বিশাল বৈচিত্র্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত না হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত সে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংযোজন, মূল্যায়ন করে নতুন তথ্য সৃষ্টি করতে পারবে না। এই দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে সে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান করে নিতে পারবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আজকের বিকাশের পেছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের অবদান। তার এবং তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটারের গণনা ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের বিকাশ বর্তমানে আইসিটিকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে।

চার্লস ব্যাবেজ

আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ বা প্রচলন শুরু হয় চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) [১৭৯১-১৮৭১] নামে একজন ইংরেজ প্রকৌশলী ও গণিতবিদের হাতে। অনেকে তাঁকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলে থাকেন। তিনি তৈরি করেন ডিফারেন্স ইঞ্জিন। ১৯৯১ সালে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে চার্লস ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে একটি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়। দেখা যায় যে, সেটি সঠিকভাবেই কাজ করছে এবং পরবর্তীতে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে একটি গণনা যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন।

অ্যাডা লাভলেস

তবে গণনার কাজটি কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় সেটি নিয়ে ভেবেছিলেন কবি লর্ড বায়রনের কন্যা অ্যাডা লাভলেস (Ada Lovelace) (১৮১৫-১৮৫২)। মায়ের কারণে অ্যাডা ছোটোবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে তার পরিচয় হলে তিনি চার্লস ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য 'প্রোগ্রামিং'-এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে অ্যাডা লাভলেসকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৪০ সালে চার্লস ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তব্য দেন। সে সময় অ্যাডা লাভলেস চার্লস ব্যাবেজের সহায়তা নিয়ে বক্তব্যের সঙ্গে ইঞ্জিনের কাজের ধারাটি ধাপ অনুসারে ক্রমাঙ্কিত করেন। তাঁর মৃত্যুর ১০০ বছর পর ১৯৫৩ সালে সেই নোট আবারো প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অ্যাডা লাভলেস অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটাই প্রকাশ করেছিলেন।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) (১৮৩১-১৮৭৯) তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা প্রকাশ করেন। তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

জগদীশ চন্দ্র বসু

বিনা তারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণে প্রথম সফল হন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (Jagadish Chandra Bose) (১৮৫৮–১৯৩৭)। ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তথ্য প্রেরণে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার প্রকাশিত না হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি।

গুগলিয়েলমো মার্কনি

বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে একই কাজ প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পান ইতালির বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কনি (Guglielmo Marconi) (১৮৭৪-১৯৩৭)। তবে ১৯৯৭ সালে ইন্সটিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রোনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (IEEE) তাঁকে স্বীকৃতি দেয় এবং রেডিও বিজ্ঞানের অগ্রপথিক ও অন্যতম আবিষ্কারক হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এ জন্য তাকে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশ শতকে ইলেকট্রনিক্সের বিকাশের পর প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের আইবিএম কোম্পানি মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে। পর্যায়ক্রমে ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হলে সাশ্রয়ী কম্পিউটার তৈরির পথ সুগম হয়।

রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন

বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল (Internet Protocol) ব্যবহার করে আরপানেট (Arpanet) আবিষ্কৃত হয়। বলা যায়, তখন থেকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করে। আর এ বিকাশের ফলে তৈরি হয় ইন্টারনেট। ১৯৭১ সালে আরপানেটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনা করেন আমেরিকার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (Ramond Samuel Tomlinson)। তিনিই প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি চালু করেন।

স্টিভ জবস

মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাবের পর বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রে সেটি ব্যবহার করে পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরির কাজ শুরু হয়। স্টিভ জবস (Steve Jobs) (১৯৫৫-২০১১) ও তার দুই বন্ধু স্টিভ ওজনিয়াক (Steve Wozaniak) ও রোনাল্ড ওয়েইন (Ronald Wayne) ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অ্যাপলের হাতেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানান পর্যায় বিকশিত হয়েছে।

উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস

অন্যদিকে ১৯৮১ সালে আইবিএম কোম্পানি তাদের বানানো পার্সোনাল কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করার জন্য William Henry Gates অথবা Bill Gates (জন্ম অক্টোবর ২৮, ১৯৫৫) ও তাঁর বন্ধুদের প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটকে দায়িত্ব দেয়। বিকশিত হয় এমএস ডস এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। বিল গেটস প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার দিয়ে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটার পরিচালিত হয়।

১৯৮৯ সালে স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি (Sir Timothy John Berners-Lee) (জন্ম জুন-৮, ১৯৫৫) নামে একজন ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (http) ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (www) জনক হিসেবে পরিচিত। নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিশ্বের নানান দেশের মধ্যে ইন্টারনেট বিস্তৃত হয়। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

স্যার টিমোথি জন বার্নার্স-লি

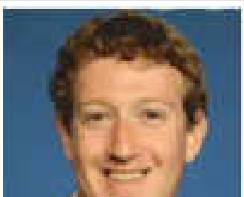

মার্ক জাকারবার্গ

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম ফেসবুক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মার্ক জাকারবার্গ (Mark Zuckerberg) (জন্ম মে ১৪, ১৯৮৪) ও তাঁর চার বন্ধুর হাতে সূচিত হয় ফেসবুকের। শুরুতে এটি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে অনেকেই ফেসবুক ব্যবহার করেন। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেকেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ব্যবহার করেন।

ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ

পৃথিবীতে জ্ঞান অর্জনের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দীর্ঘদিন থেকে মোটামুটি একইভাবে কাজ করে আসছিল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার পর প্রথমবার সেই পদ্ধতির এক ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এবং ই-লার্নিং নামে নতুন কিছু শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি। ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্যে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং কিন্তু মোটেও সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের একটা বিষয় পড়ানোর সময় অনেক কিছুই হয়তো হাতে-কলমে দেখানো সম্ভব নয়। যেমন- সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে পাঠ দিতে দিতে শিক্ষক ইচ্ছে করলেই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্য নিয়ে আরও সুন্দরভাবে বিষয়টির দৃশ্যমান উপস্থাপন করতে পারেন। সেটি এমনকি Interactive-ও হতে পারে।

আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। সে কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে ই-লার্নিং অনেক বড়ো একটা ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিয়ো করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্যে অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষকই এটি ব্যবহার করছেন।

সারা পৃথিবীতেই ই-লার্নিংয়ের জন্যে নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড়ো বড়ো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং অনেক সময়েই একজন সেই কোর্সটি নেওয়ার পর তার হোমওয়ার্ক জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট পর্যন্ত অর্জন করতে পারছে।

আমাদের বাংলাদেশও এতে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা এ ধরনের বেশ কিছু ওয়েব পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার উপযোগী এই ধরনের সাইটগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড়ো ভূমিকা রাখতে পারলেও আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, এটি কিন্তু কোনোভাবেই প্রচলিত পাঠদানের বিকল্প নয়। প্রচলিত পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের সরাসরি দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে নানাভাবে ভাব বিনিময় করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা পাশাপাশি একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে, একে অন্যের সহযোগী হয়ে শিখতে পারে। ই-লার্নিংয়ের বেলায়

এই বিষয়গুলো প্রায় সময়ই অনুপস্থিত থাকে, পুরো প্রক্রিয়ায় মানবিক অংশটুকু না থাকায় পদ্ধতিটা যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে। সে কারণে ই-লার্নিংকে সফল করতে হলে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হয়।

আমাদের বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের অনেক বড়ো সুযোগ আছে, কারণ অনেক বড়ো বড়ো সীমাবদ্ধতা আসলে ই-লার্নিং ব্যবহার করে সমাধান করে ফেলা সম্ভব। তবে প্রচলিত ই-লার্নিংয়ের জন্যে ইন্টারনেটের স্পিড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ই-লার্নিংয়ের শিখনসামগ্রী (materials) তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার গুরুত্বের সাথে এ ধরনের শিখনসামগ্রী তৈরি করছে। এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবে।

দলগত কাজ

শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ই-লার্নিং কী ভূমিকা রাখতে পারে দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ

গুড গভর্ন্যান্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স।

একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর। মাত্র দুই-দশক আগেও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরেও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। ফলে, ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোবাইল ফোনে আবেদন করার সুবিধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্বে যশোর জেলায় একজন শিক্ষার্থী সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এজন্য নিজে অথবা প্রতিনিধিকে সিলেট গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনেই এই আবেদন করা যায়। ফলে, ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফরম জোগাড় ও জমা দেওয়ার জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না।

আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র। এর ফলে আগে যেখানে কোনো সেবা পেতে ২/৩ সপ্তাহ লাগত, সেটি এখন মাত্র ২-৫ দিনে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেই নাগরিককে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায়। কেবল বিদ্যুৎ নয়, পানি ও গ্যাসের বিলও এখন অনলাইনে ও মোবাইল ফোনে পরিশোধ করা যায়। গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানিমুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে

২০২৫

কোনো কোনো কার্যক্রম ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টা করা সম্ভব যেমন- ATM সেবা, Mobile ব্যাংকিং, তথ্য সেবা ইত্যাদি। ফলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

অন্যদিকে ই-গভর্ন্যান্স চালুর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের দক্ষতাও বেড়েছে। ফলে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্স চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়েছে। এখনো কিছু ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হওয়া বাকি রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হলে সুশাসনের পথে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

ই-সার্ভিস ও বাংলাদেশ

সরকারি এবং বেসরকারি অনেক সেবামূলক সংস্থা সার্বক্ষণিকভাবে অথবা সময়ে সময়ে দেশের জনগণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবা হতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত কিংবা কোনো জমির দলিলের নকল সরবরাহ করা। ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বে এই সকল সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে অবশ্যই সেবাদাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হতো। কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতা নিজ বাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে বা ইন্টারনেটে একই সেবা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য কোনো আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট সংগ্রহের কথা বিবেচনা করা যায়। কিছুদিন পূর্বেও এই **টিকিট** সংগ্রহের জন্য যাত্রী নিজে অথবা তার কোনো লোকের ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে **টিকিট** সংগ্রহ করতে হতো। এই পদ্ধতি এখনও বহাল আছে। তবে, এর পাশাপাশি এখন যে কেউ অনলাইনে **টিকিট** সংগ্রহ করতে পারে। অনলাইনেই টিকিটের মূল্য পরিশোধ করা যায়। এভাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যাপারটি ই-সার্ভিস বা ই-সেবা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ই-সেবার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–এটি স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই অনেক ই-সেবা চালু হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল সংস্করণ, ই-পুর্জি, ই-পর্চা, ই-**টিকিট**, টেলিমেডিসিন, অনলাইন আয়কর হিসাব করার ক্যালকুলেটর ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই-সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. **ই-পুর্জি :** দেশের প্রথম দিককার ই-সেবাসমূহের একটি। দেশের ১৫টি চিনিকলের সকল আখচাষি এখন এসএমএসের মাধ্যমে পুর্জি তথ্য পাচ্ছে। পুর্জি হচ্ছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সে জন্য আওতাধীন আখচাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র। এসএমএসের মাধ্যমে আখচাষিরা তাৎক্ষণিকভাবে পুর্জির তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সময়মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে।

খ. **ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (ই-এমটিএস) :** বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়। দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায়।

গ. **ই-পর্চা সেবা :** বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। এটিকে বলা হয় ই-পর্চা। পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীগণ বড়ো বড়ো রেকর্ড বই থেকে তথ্যসমূহ পূর্ব নির্ধারিত ছকে পূরণ করে আবেদনকারীকে সরবরাহ করতেন। এজন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে পর্চা তৈরি করতেন। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী দেশ-বিদেশের যেকোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারেন।

ঘ. **ই-স্বাস্থ্যসেবা :** বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী হাসপাতালে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

ঙ. **রেলওয়ের ই-টিকিটিং ও মোবাইল টিকিটিং :** বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট এখন মোবাইল ফোনেও ক্রয় করা যায়। আবার অনলাইনেও টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, নিজের সুবিধামতো সময়ে রেলস্টেশনে না গিয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যের টিকিট সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফোন বা অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করা হলে ট্রেন ছাড়ার অল্প সময় পূর্বে যাত্রীকে স্টেশনে যেতে হয় এবং মোবাইল ফোন বা অনলাইনে প্রাপ্ত গোপন নম্বর প্রদর্শন করে সেখানে নির্ধারিত কাউন্টার থেকে যাত্রার টিকিট সংগ্রহ করে নিতে হয়।

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যেরও একটি বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও বাণিজ্য করা যায়, যার প্রচলিত নাম ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য।

যেকোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে। প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা। দ্বিতীয়ত ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা। এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার 'দোকান'টি খুলে বসতে পারেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। তৃতীয়ত মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (কুরিয়ার সার্ভিস) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরও একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে ই–কমার্সের প্রসার হচ্ছে। বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, শৌখিনসামগ্রী ইত্যাদি ই-কমার্সের মাধ্যমে বেচাকেনা হচ্ছে। প্রচলিত বাণিজ্যের মতো ই-কমার্সেও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এক ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে। তোমরা ইতোমধ্যে ওয়েবসাইট, টিভি বা পত্র-পত্রিকায় এধরনের অনেক ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন দেখে ফেলেছ।

বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন কর্মক্ষেত্রে আইসিটির বহুমুখী প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রভাব ও পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আইসিটির দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথমত প্রচলিত কর্মক্ষেত্রগুলোতে আইসিটির প্রয়োগের ফলে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ, অন্যদিকে আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

প্রচলিত কর্মক্ষেত্র এবং পুরাতন ব্যবসা-বাণিজ্যে আইসিটি ব্যবহারের ফলে কর্মীদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। অন্যদিকে এর ফলে সেবার মানও উন্নত হয়েছে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের সাধারণ দক্ষতা একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়। ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানি, সরকারি দপ্তরে কাজ করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর থেকে উপস্থাপনা সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং থেকে ই-মেইল, নানান ধরনের বিশ্লেষণী সফটওয়্যার ইত্যাদিতে দক্ষ হতে হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষায়িত সফটওয়্যার (যেমন: ব্যাংকিং সফটওয়্যার) ব্যবহারেও পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়।

অন্যদিকে আইসিটি নিজেই একটি বড়ো আকারের কর্মবাজার সৃষ্টি করেছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি এখন নতুন দক্ষ কর্মীদের জন্য একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। কেবল দেশে নয়, আইসিটিতে দক্ষ কর্মীরা দেশের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এই কাজের একটি বড় অংশ দেশে বসেই সম্পন্ন করা যায়। আউটসোর্সিং করে এখন অনেকেই বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

সামাজিক যোগাযোগ ও আইসিটি

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে চলাফেরা ও বিকাশের জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রয়োজন। তবে এখন আইসিটিতে সামাজিক যোগাযোগ বলতে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে এই যোগাযোগ হয়ে পড়েছে সহজ, সাশ্রয়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ। ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই-মেইল, মোবাইল ফোন ও মেসেজিং সিস্টেম, ব্লগিং এবং সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মসমূহ ব্যবহার করে বর্তমানে আইসিটিভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ অনেকাংশে সহজ।

ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে অনেক প্ল্যাটফর্ম, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। যেমনঃ ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন ও ইনস্টাগ্রাম। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি মাধ্যম হলো–ফেসবুক ও টুইটার।

- **ফেসবুক (www.facebook.com) :** ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটি চালু করেন। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারে। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে অডিয়ো ও ভিডিয়ো প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ যেমন খুলতে পারে, তেমনি সমমনা বন্ধুরা মিলে চালু করতে পারে কোনো গ্রুপ। www.stastica.com এর রিপোর্ট (এপ্রিল ২০২৪) অনুযায়ী বিশ্বে facebook ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.০৫ বিলিয়ন।
- **টুইটার (www.twitter.com)** বা X : টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ Character-এর মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট (tweet)। টুইটারের সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য সে সদস্যকে অনুসরণ বা follow করতে পারেন। কোনো সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় follower বা অনুসারী।
- **ইনস্টাগ্রাম (www.instragram.com) :** ইনস্টাগ্রাম হলো একটি জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এটা ২০১০ সালে চালু হয়েছিল। এটাকে মূলত ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়। এতে ব্যবহারকারীগণ গল্প তৈরি করতে এবং হ্যাশট্যাগের (hashtag) মাধ্যমে বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করতে পারে। এতে রিল (reels) এবং কেনাকাটার সুযোগও রয়েছে, যার মাধ্যমে ব্র্যান্ড এবং প্রভাবশালীগণ তাদের অনুসারি বা ভিজিটরদের সাথে কার্যকরভাবে জড়িত হতে পারে। এটিকে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের অন্যতম প্লাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিনোদন ও আইসিটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে বিনোদনের জগতে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এটি ঘটেছে দুইভাবে। প্রথমত, বিনোদনটি কীভাবে মানুষ গ্রহণ করবে সেই প্রক্রিয়াটিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

দেখা যাক বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়ার পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটেছে। একটা সময় ছিল যখন বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে হলে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে হলে খেলার মাঠে যেতে হতো, গান শুনতে হলে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন এধরনের বিনোদনের জন্যে মানুষের আর ঘর থেকে বের হতে হয় না। প্রথমে রেডিও, তারপর টেলিভিশন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। একসময় কম্পিউটার সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাথে। আমরা আবিষ্কার করেছি একজন মানুষ চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ থেকেই পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে। প্রথম যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল তখন তার মূল কাজ ছিল কমপিউট বা হিসাব করা, শুধু বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান বা সরকার একটা কম্পিউটারের মালিক হতে পারত। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটার সহজলভ্য হয়ে এসেছে এবং একসময় মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কম্পিউটার যখন শক্তিশালী হয়েছে তখন এটি শুধু লেখালেখি বা হিসাব-নিকাশের জন্যে ব্যবহৃত না হয়ে ধীরে ধীরে বিনোদনের জন্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখন সাধারণ মানুষ কম্পিউটারকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে বিনোদনের জন্যে। গান, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র সবকিছুই এখন কম্পিউটার দিয়ে

করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে যেরকম পরিবর্তন এসেছে ঠিক সেরকম পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের বিষয়গুলোতে। সঙ্গীতকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ায় এখন আমরা কম্পিউটারে গান শুনতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা ভিডিয়ো বা চলচ্চিত্র দেখতে পারি। সিডি রম কিংবা ডিভিডি বের হওয়ার পর সেখানে বিশাল পরিমাণের তথ্য রাখা সম্ভবপর হয়েছে। সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশনে ডিভিডি থেকে চলচ্চিত্র দেখা এখন খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানোর পর দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে। কাজেই এখন একজনকে আর গান শোনার জন্যে কিংবা চলচ্চিত্র দেখার জন্যে অডিয়ো সিডি বা ডিভিডির উপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয় রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে শোনা ও দেখা যায় এবং সেগুলো অনেক সময়েই রেকর্ড করা থাকে বলে কাউকেই আর কোনো কিছুর জন্যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় না, যখন যেটি দেখার ইচ্ছে করে তখনই সেটা দেখতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত হবার পর নতুন কিছু বিনোদনের জন্ম হয়েছে যেটি আগে উপভোগ করা সম্ভব ছিল না, তার একটি হচ্ছে কম্পিউটার গেম। সারা পৃথিবীতেই এখন কম্পিউটার গেমের বিশাল শিল্প তৈরি হয়েছে এবং নানা ধরনের কম্পিউটার গেমের জন্ম হয়েছে। কম্পিউটার গেমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারি এটি বিনোদনের অত্যন্ত সফল একটি মাধ্যম। এর সাফল্যের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে এটি ছোটো শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষ সবাইকেই তার নিজের রুচি মাফিক আনন্দ দিতে পারে। একজন আরেক জনের সাথে কম্পিউটার গেম খেলতে পারে, কম্পিউটারের সাথে খেলতে পারে এমনকি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাইরের কারো সাথেও খেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনোদন উপভোগের তীব্রতা এত বেশি হতে পারে যে, সেটি এক ধরনের আসক্তির জন্ম দিতে পারে এবং সে কারণে কম্পিউটার গেম উপভোগ করার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতেই সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিনোদন সৃষ্টির ব্যাপারেও এক ধরনের বড়ো ভূমিকা রেখেছে। অ্যানিমেশন বা কার্টুন তৈরি করা এক সময় অনেক কঠিন একটা বিষয় ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি এবং শক্তিশালী কম্পিউটারের কারণে এখন এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনশীলতার কারণে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। সত্যিকারের অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াই গ্রাফিক্স নির্ভর চলচ্চিত্রের ডিজিটাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্ম হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে কাল্পনিক প্রাণী ডাইনোসর কিংবা ভিন্ন জগতের প্রাণী তৈরি করার জন্যে শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করা এখন অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়।

এক কথায় আমরা বলতে পারি, তথ্যপ্রযুক্তির কারণে শুধু যে নতুন নতুন বিনোদনের জন্ম নিচ্ছে তা নয়, সেই বিনোদনগুলো এখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো কথা এটি মাত্র শুরু, ভবিষ্যতে আইসিটি নির্ভর বিনোদন কোন পর্যায়ে যাবে সেটি কল্পনা করাও অসম্ভব!

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কাজটি শুরু করেছে দেরিতে। তাই অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। অতীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলেও বর্তমানে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হওয়ায় আমাদের দেশে এখন দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

প্রযুক্তি প্রসারের একটি সুন্দর দিক রয়েছে, কোনো দেশ বা জাতির একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে সব সময়েই তাদের পিছিয়ে থাকতে হয় না। বড়ো বড়ো লাফ (leap frog) দিয়ে অন্যদের ধরে ফেলা যায়। তাই বাংলাদেশ তার সর্বশক্তি দিয়ে সামনে এগিয়ে অন্য দেশের সমান হবার চেষ্টা করছে।

ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) কর্তৃক প্রণীত আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (IDI) এর ২০২৪ সংস্করণে বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে ৬২ নম্বর পেয়েছে। বাংলাদেশের এই স্কোরটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশসমূহের গড়ের (৬৪.৮) চেয়ে কম এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের গড়ের (৭৭.৩) চেয়ে অনেক কম। এই সূচকে মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম ও ভুটান বাংলাদেশের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে উপরে অবস্থান করছে আর পাকিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশের পরে।
ই-গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে সরকারের সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়নের অবস্থা উপস্থাপন করার জন্য ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সূচক (E-Government Development Index) ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অবকাঠামো, অনলাইন পরিসেবা, টেলিযোগাযোগ সংযোগ এবং আইসিটি ব্যবহারে মানুষের সক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনায় ২০২৪ সালে প্রণীত এই ইনডেক্সে ১৯৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম। কাজেই আইসিটি ব্যবহারে বাংলাদেশকে আরও অনেক পথ এগুতে হবে।

সরকারের আগ্রহের কারণে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সারা দেশে ফাইবার অপটিক লাইন বসিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাত্র এক-দেড় দশক আগেও এদেশে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় এই দেশের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতের নাগালে ফোন রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার খোলা হয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকায় পোস্ট অফিসগুলোকে ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করে মোবাইল মানি অর্ডারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টারের সাথে সাথে ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সেল এবং ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেল দেশের অবকাঠামোতে একটা বড়ো সংযোজন। মোবাইল টেলিফোন দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল জানা কিংবা ট্রেনের টিকিট কেনার মতো কাজগুলো নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পাঠ সংযোজন করা হয়েছে– এই বইটি তার প্রমাণ। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানো হচ্ছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেরা কোম্পানি গড়ে তুলছে এবং বিশাল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ব্যক্তিগত পর্যায়ে আউটসোর্সিং করে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করছে।

২০১৮ সালের ১২ই মে তারিখটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিনে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম রাষ্ট্র হিসেবে তার নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে প্রেরণ করে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, আবহাওয়ার পূর্বভাস নানা ক্ষেত্রে সুফল পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করবে। টেলিভিশন সেবা ও জাতীয় নিরাপত্তার কাজেও এ স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করা যাবে। বাংলাদেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও সম্ভব হবে।

দলগত কাজ
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় নিয়ে একটি পোস্টার ডিজাইন কর।

অনুশীলনী

১. লন্ডন বিজ্ঞান জাদুঘর যান্ত্রিকভাবে গণনা করতে সক্ষম ইঞ্জিন কত সালে তৈরি করে?

ক. ১৮৩৩ খ. ১৮৪২

গ. ১৯৫৩ ঘ. ১৯৯১

২. কোন আবিষ্কারকের আবিষ্কারের ফলে আজকের পৃথিবীতে ঘরে বসেই অফিসের কাজ করা সম্ভব হচ্ছে?

ক. চার্লস ব্যাবেজ খ. অ্যাডা লাভলেস

গ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঘ. জগদীশ চন্দ্র বসু

৩. ফেসবুকের নির্মাতা কে?

ক. স্টিভ জবস খ. বিল গেটস

গ. মার্ক জাকারবার্গ ঘ. টিম বার্নার্স লি

৪. সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে–

i. স্বল্পসময়ে সরকারি সেবা পাওয়া যাবে

ii. সরকারি সেবার মান উন্নত হবে

iii. ছুটির দিনেও অনেক সরকারি সেবা পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুমন সেন্টমার্টিন বেড়াতে যেয়ে অসুস্থ হয়ে গেলে ফোনে সে ঢাকায় একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে। তিনি সুমনকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে বলেন। পরে হাসপাতালের ডাক্তার ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে সুমনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

৫. স্থানীয় ডাক্তার যে পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন তা হলো-

i. টেলিমেডিসিন সেবা

ii. ই-স্বাস্থ্যসেবা

iii. ই- কমার্স সেবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. সুমনের চিকিৎসায় কোন প্রযুক্তিটির ভূমিকা প্রধান?

ক. আইসিটি খ. টেলিভিশন

গ. রোবট ঘ. কম্পিউটার

৭. কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার জাদুর চর গ্রামের মিলন বাড়িতে বসেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে?

৮. বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূর করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা

এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- Software uninstall এবং Software delete -এর পার্থক্য করতে পারব;
- সাইবার ঝুঁকি ও তথ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা পারব;
- মানুষের জীবনে সাইবার অপরাধের প্রভাব ও সাইবার আক্রমণের শিকার হলে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা পারব;
- অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- অতিমাত্রায় গেমস খেলার নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সফটওয়্যার পাইরেসির বিষয়টি বর্ণনা করতে পারব;
- কপিরাইট আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহের সাথে সাথে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কম্পিউটারের ট্রাবল শুটিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কম্পিউটারের সাধারণ সমস্যার ট্রাবলশ্যুট করতে পারব।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ

কম্পিউটার হচ্ছে কিছু ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ (হার্ডওয়্যার) ও সফটওয়্যারের সমন্বিতরূপ। সুতরাং এর থেকে ভালো সেবা (সার্ভিস) পেতে হলে একে অবশ্যই পরিচর্যা করতে হবে। বাইরের বিভিন্ন নিয়ামক যেমনঃ আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎক্ষেত্র, চুম্বকক্ষেত্র,ধূলিকণা, ধোঁয়া, পানি ইত্যাদির প্রভাব থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি এর মধ্যে থাকা অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারও আপডেট রাখতে হবে। কাজেই কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করে ভাল অবস্থায় রাখার প্রচেষ্টাকে বুঝায়। কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ দুই প্রকারের হতে পারে। যথা-

১। প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ (Preventive maintenance): কম্পিউটারের ফল্ট (fault) বা সমস্যা তৈরি হওয়ার পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়াকে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়। ব্যবহারকারী নিজে নিজেই এই ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। যেমন-ভাইরাস স্ক্যান, ডিস্ক ক্লিন, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন, সফটওয়্যার আপডেট ইত্যাদি।

২। সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ (corrective maintenance): কম্পিউটারের ফল্ট বা সমস্যা তৈরি হওয়ার পর তা মেরামত বা পরিবর্তন করে কম্পিউটারকে কর্মক্ষম করাকে সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়। সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাধারণত কম্পিউটার টেকনিশিয়ানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়,কম্পিউটারের আশেপাশে কোনো ধাতব পদার্থ বা চৌম্বক জাতীয় পদার্থ রাখা যাবে না। এছাড়া ইলেকট্রিক শক থেকে রক্ষা পাবার জন্য অবশ্যই কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থায় আর্থিং থাকা উচিত।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

ঘটনা ১ : রায়না কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার কাছে বায়না ধরেছিল একটি ল্যাপটপ কিনে দেবার জন্য। বাবা প্রথম সাময়িকের ফল ভালো হওয়ায় রায়নাকে একটি কোর আই ফাইভ প্রসেসরযুক্ত একটি ল্যাপটপ কিনে দিলেন। ল্যাপটপ পেয়ে এবং এর গতি দেখে রায়না মুগ্ধ। সে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলল। কিন্তু রায়না লক্ষ করল তার ল্যাপটপটি আস্তে আস্তে ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মাথায় এসে রায়না দেখল তার ল্যাপটপটি এতটাই ধীর হয়ে গেছে যে, কাজ করতে গিয়ে রায়না মহা বিরক্ত। কিছুদিন পর সে বাবাকে আরেকটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল।

ঘটনা ২ : অংকন তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে। এতে তার লেখাপড়ার অনেক উপকার হচ্ছে। লেখাপড়া ছাড়াও সে বন্ধুদের ই-মেইল করা, গান শোনা ও ছবি দেখার কাজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইদানীং সে দেখছে কম্পিউটারটি কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অংকনের ইচ্ছা ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঢুকে যাচ্ছে। একদিন ইউএসবি পোর্টে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সে অবাক হয়ে দেখল তার সব ফাইল শর্টকাট হয়ে গেছে। মূল ফাইলগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

ঘটনা ১ : রায়না কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাবার কাছে বায়না ধরেছিল একটি ল্যাপটপ কিনে দেবার জন্য। বাবা প্রথম সাময়িকের ফল ভালো হওয়ায় রায়নাকে একটি কোর আই ফাইভ প্রসেসরযুক্ত একটি ল্যাপটপ কিনে দিলেন। ল্যাপটপ পেয়ে এবং এর গতি দেখে রায়না মুগ্ধ। সে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলল। কিন্তু রায়না লক্ষ করল তার ল্যাপটপটি আস্তে আস্তে ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মাথায় এসে রায়না দেখল তার ল্যাপটপটি এতটাই ধীর হয়ে গেছে যে, কাজ করতে গিয়ে রায়না মহা বিরক্ত। কিছুদিন পর সে বাবাকে আরেকটি ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল।

ঘটনা ২ : অংকন তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েছে। এখন সে প্রায়ই ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে। এতে তার লেখাপড়ার অনেক উপকার হচ্ছে। লেখাপড়া ছাড়াও সে বন্ধুদের ই-মেইল করা, গান শোনা ও ছবি দেখার কাজেও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইদানীং সে দেখছে কম্পিউটারটি কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে রিস্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাঝে মাঝে অংকনের ইচ্ছা ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঢুকে যাচ্ছে। একদিন ইউএসবি পোর্টে পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সে অবাক হয়ে দেখল তার সব ফাইল শর্টকাট হয়ে গেছে। মূল ফাইলগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

উপরের ঘটনা দুটো থেকে তোমরা কী বুঝলে? তোমাদের অনেকের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যাচ্ছে? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে এতদিনে তোমাদের অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই হলো মূলযন্ত্র। নতুন একটি কম্পিউটার তা ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট যাই হোক না কেন দেখবে খুব ভালো বা দ্রুতগতিতে কাজ করছে। কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করার পরে দেখবে এটি ক্রমশ ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরানো হলে যন্ত্রটি কেমন যেন ধীর হয়ে যায়। অনেক সময় একটি কমান্ড দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, রাগান্বিত হয়ে আরেকটি নতুন কম্পিউটার কিনে ফেলতে ইচ্ছা করে!

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তাহলে কী? এখানেই রয়েছে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব। নিচের শ্রেণিতে তোমরা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছ। বেশিরভাগ মানুষেরই আইসিটি যন্ত্রপাতি বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করতে ভালো লাগে না। কিন্তু তারপরও এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি তোমার আইসিটি যন্ত্র বা কম্পিউটারটি সচল ও পূর্ণমাত্রায় কার্যক্ষম রাখতে চাও তবে অবশ্যই এটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। একাজের জন্য তোমার যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আসলে আমরা এখানে আইসিটি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলছি।

তোমার আইসিটি যন্ত্রটিতে যদি মাইক্রোসফট কোম্পানির উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে (বিশ্বের বেশিরভাগ কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়) থাকে তবে অপারেটিং সিস্টেম সবসময় হালনাগাদ বা আপডেট করতে হবে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে এ আপডেটগুলো সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমও প্রায় একই ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে। তাছাড়া তোমাকে অবশ্যই মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটারকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য। যদি রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ ব্যবহার না কর তোমার কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রটি ঠিকভাবে কাজ করবে না এবং তোমার জন্য অনেক সময় বিরক্তির কারণ হবে।

এছাড়াও প্রত্যেকবার কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় বেশ কিছু টেম্পোরারি ফাইল তৈরি হয়। অনেকদিন এ ফাইলগুলো না মুছে দিলে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা দখল করে রাখে এবং কম্পিউটারের গতিকে ধীর করে দেয়। সে জন্য আমাদের সবারই উচিত সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে টেম্পোরারি ফাইলগুলো মুছে দেওয়া। এতে হার্ডডিস্কের বেশ খানিকটা জায়গা খালি হবে আবার কম্পিউটারের কাজ করার গতিও বেড়ে যাবে অনেক।

ইদানীং ইন্টারনেট ব্যবহার করা ছাড়া আইসিটি যন্ত্রের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করলে তোমার ইন্টারনেট ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে অনেক কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়। এতে আইসিটি যন্ত্রটি ক্রমান্বয়ে ধীর হয়ে যায়। প্রতিদিন সম্ভব না হলেও কিছুদিন পর পর ক্যাশ মেমোরি পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। এ কাজটি করতে সফটওয়্যার তোমাকে সাহায্য করবে।

এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার ছাড়া বর্তমানে আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এধরনের সফটওয়্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যার মাধ্যমে আইসিটি যন্ত্র ব্যবহারকারীগণ তাদের যন্ত্রে ভাইরাসসহ ম্যালওয়্যার বা স্পাইওয়্যারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। পাশাপাশি নির্বিঘ্নে তাদের যন্ত্র বা যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এখন অনেক এন্টিভাইরাস এবং এন্টি ম্যালওয়্যার বা এন্টি স্পাইওয়্যার বিনামূল্যে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। এমনকি এ সফটওয়্যারগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপডেট করা যায়। হালনাগাদ বা আপডেটেড এন্টিভাইরাস ছাড়া আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কম্পিউটারের কাজ করার গতি বজায় রাখার জন্য প্রায় সব ব্যবহারকারী ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার ব্যবহার করে থাকে। এ প্রোগ্রামগুলো সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে। এ সফটওয়্যার দুটো হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে এবং ফাইলগুলো এমনভাবে সাজায় যাতে কম্পিউটার গতি বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও আনইনস্টলেশন

আমরা সবাই জানি আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রে ইনস্টল করতে হয়। আমরা যখন কোনো আইসিটি যন্ত্র কিনি তখন বিক্রেতা সাধারণত আমাদের জিজ্ঞাসা করে আমাদের কোন কোন সফটওয়্যার প্রয়োজন। অতঃপর অপারেটিং সফটওয়্যারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে ইনস্টল করে বিক্রেতা যন্ত্রটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। এভাবে আমরা নিজেদের প্রয়োজনমতো আইসিটি যন্ত্র তথা কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া একটু জটিল এবং এর জন্য কিছু বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়াও আইসিটি যন্ত্র ব্যবহার করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারকারীর যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ইনস্টল করতে হয়।

কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পূর্বে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা প্রয়োজন:

- যে সফটওয়্যার ইনস্টল করা হবে তা তোমার যন্ত্রের হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা;
- read me ফাইলটিতে জরুরি কিছু কাজের কথা লেখা আছে কিনা পড়ে নিতে হবে;
- ইনস্টলেশনের সময় অন্য সকল কাজ বন্ধ আছে কিনা (বন্ধ না থাকলে অনেক সময় নতুন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে ঝামেলা হয়);
- এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার বন্ধ আছে কিনা; এবং
- অপারেটিং সিস্টেমের এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা (বিশেষ কোনো যন্ত্র ছাড়া প্রায় সব যন্ত্রেরই এ অনুমোদন দেওয়া থাকে)।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল করার প্রক্রিয়া অনেকটাই অপারেটিং সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে। তবে এ প্রক্রিয়া অনেকটা একই ধরনের। কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে প্রথমেই আমাদের সফটওয়্যারটির সফট বা ডিজিটাল কপি প্রয়োজন হবে। এ সফট কপিটি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফটওয়্যারগুলোর সাথে Auto run নামে একটি প্রোগ্রাম সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। তোমাদের কম্পিউটারে সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে Auto run প্রোগ্রামটি সচল হয়ে যায় এবং সফটওয়্যারটি setup করার অনুমতি চায়। অনুমতি প্রদান করার পর পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করলেই সফটওয়্যারটি তোমার যন্ত্রে ইনস্টল হয়ে যাবে। সাধারণত যন্ত্রটি restart করলেই ইনস্টলকৃত প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা শুরু করা যায়।

সফটওয়্যার আনইনস্টলেশন

এখন মনে কর ইনস্টল করা কোনো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার আর প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা কী করব? বেশিরভাগ ব্যবহারকারী সফটওয়্যারটি তার যন্ত্রেই রেখে দেয়। কিন্তু এতে হার্ডডিস্কের অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়। আবার অনেক সময় আইসিটি যন্ত্রটি পরিচালনা করতে ঝামেলা সৃষ্টি করে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আনইনস্টল করে ফেলা।

এখন প্রশ্ন হলো আনইনস্টল কীভাবে করব? এ কাজটি করতেও অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আমাদের সাহায্য করে থাকে। প্রায় সব অপারেটিং সিস্টেমের কাজের ধরন একই। তবে এন্ড্রয়েড চালিত যন্ত্র বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ টাচস্ক্রিনযুক্ত স্মার্টফোনগুলো থেকে সফটওয়্যার আনইনস্টল করা খুবই সহজ। সেটিংস থেকে আপ্লিকেশন সিলেক্ট করে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারটিতে টাচ করলে পর্দায় একটি মেনু আসবে। সেখানে আনইনস্টল লেখা জায়গায় টাচ করার পর সফটওয়্যারটি আনইনস্টল হয়ে যাবে।

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ-এর অপারেটিং সিস্টেম যা কিনা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ তাদের আইসিটি যন্ত্রে তথা কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকে, সেসব যন্ত্র হতে সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

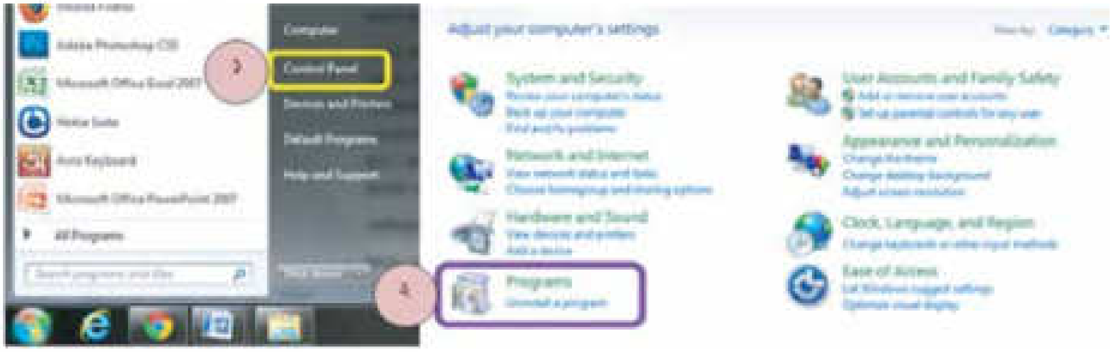

প্রথমে স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে। অতঃপর ডাবল ক্লিক করে 'অ্যাড অর রিমুভ' অথবা 'আনইনস্টল প্রোগ্রাম'-এ ঢুকতে হবে।

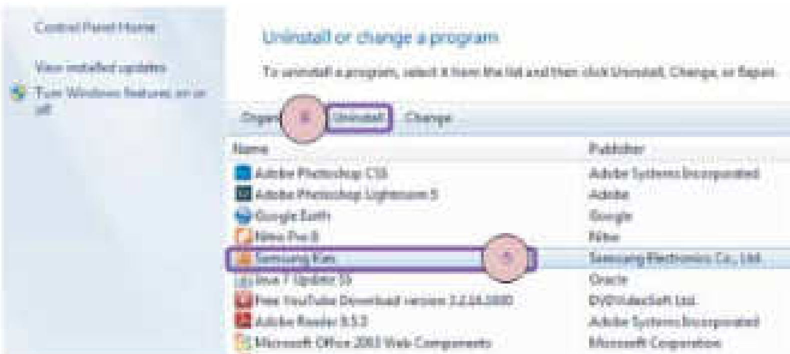

এরপর যে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করতে চাও সেটি খুঁজে ক্লিক করে আনইনস্টলে ক্লিক করলেই ফাইলটি আনইনস্টল হতে শুরু করবে। ফাইল বড়ো হলে আনইনস্টল হতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। আনইনস্টল করার পর সাধারণত কম্পিউটার রিস্টার্ট করতে হয়। তবে কোনো সফটওয়্যার আনইনস্টল করার সময় নিশ্চিত হয়ে তা করতে হবে। অন্যথায় ভুলক্রমে এমন সফটওয়্যার আনইনস্টল হতে পারে, যার কারণে তোমার যন্ত্রটিতে পুনরায় সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা ছাড়া চালানো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

কাজ

প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শিক্ষক নির্দেশিত একটি সফটওয়্যার আনইনস্টল কর।

সফটওয়্যার ডিলিট

আমরা জানি ডিলিট অর্থ মুছে ফেলা। মূলত সফটওয়্যার আনইনস্টল করার মাধ্যমে আমরা আমাদের আইসিটি যন্ত্র হতে ইনস্টল করা যেকোনো সফটওয়্যার মুছে ফেলতে পারি। নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে তাহলে ডিলিট দিয়ে কী করব? কম্পিউটার বা অন্য যেকোনো আইসিটি যন্ত্রে কোনো সফটওয়্যার একবার ইনস্টল করলে আনইনস্টলের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না। আবার নিয়ম না মেনে শুধু সফটওয়্যারটি ডিলিট করে দিলে সফটওয়্যারটি মুছে তো যায়ই না বরং আরো সমস্যা তৈরি করে। আনইনস্টল করলে সফটওয়্যারটির কিছু অংশ অপারেটিং সিস্টেমের রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। নিয়ম অনুসরণ করে ডিলিট করলে যেকোনো সফটওয়্যার সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা সম্ভব। নিচে নিয়মটি দেখানো হলো। এ কাজটি করতেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ডিলিট করতে যা করতে হবে : প্রথমে পূর্বের নিয়মে সফটওয়্যারটি আনইনস্টল করতে হবে। পরে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

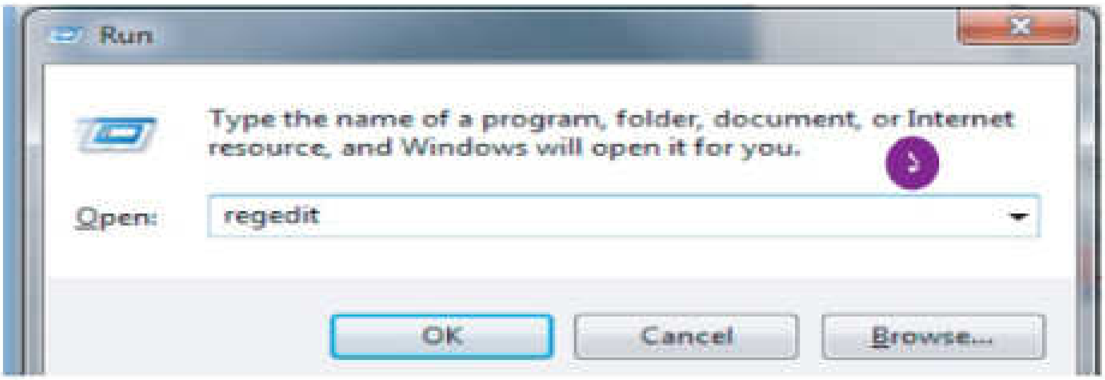

১. প্রথমে কীবোর্ডের + r একসাথে চেপে Run Command চালু করতে হবে। তারপর regedit লিখে ok বাটন ক্লিক করতে হবে।

২. ফাইল মেনুতে প্রবেশ করতে হবে।

৩. Export -এ ক্লিক করতে হবে।

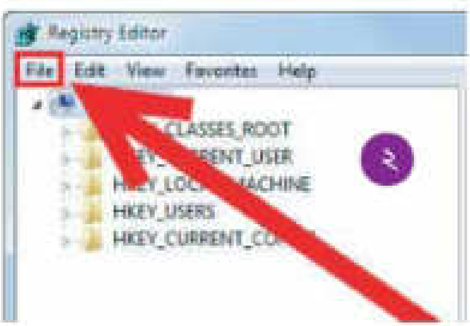

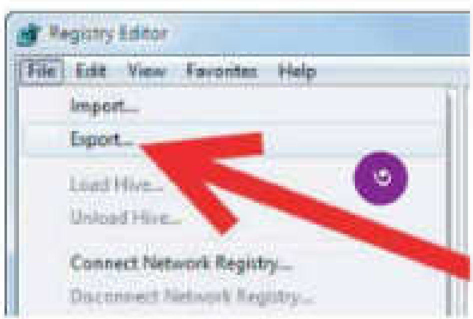

৪. অপারেটিং সফটওয়্যার যে ড্রাইভে রয়েছে অর্থাৎ C সিলেক্ট করতে হবে।

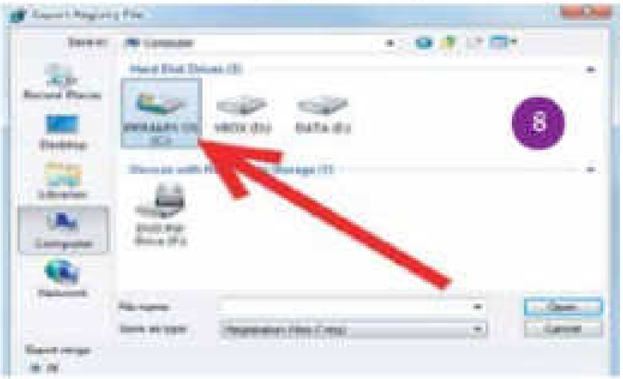

৫. নাম দিয়ে ফাইলটি সেভ করতে হবে। এটি খুবই জরুরি। কোনো ভুল হলে যাতে সিস্টেম ঠিক করা যায়।

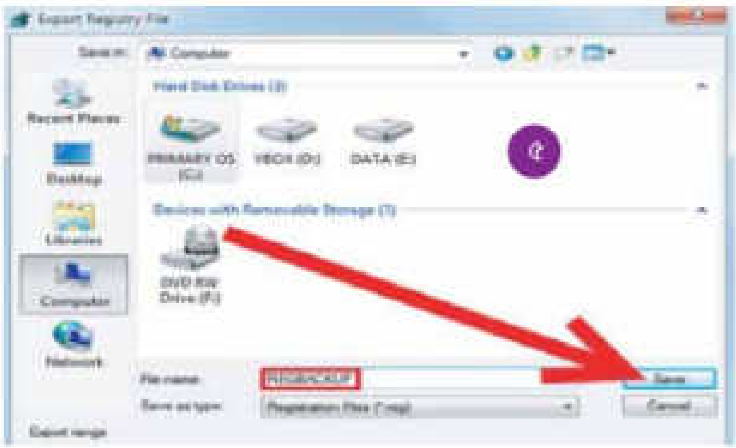

৬. অতঃপর Edit -এ প্রবেশ করতে হবে।

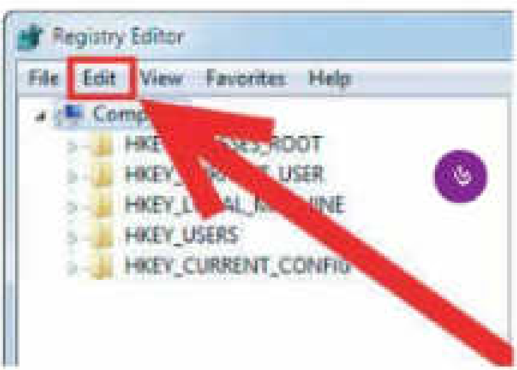

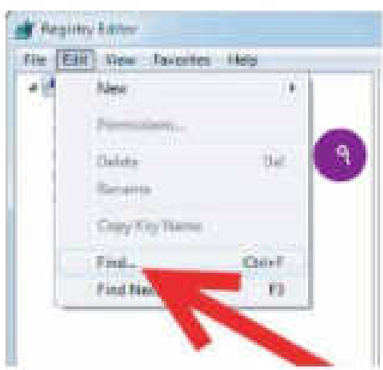

৭. Find -এ যেতে হবে।

৮. যে সফটওয়্যারটি ডিলিট করতে চাই তার নাম খুঁজতে হবে, যেমন এখানে AUDIALS

৯. Find Next -এ ক্লিক করতে হবে।

১০. এভাবে সিলেক্ট করতে হবে।

১১. এবার ডান বাটন ক্লিক করে Delete -এ ক্লিক করে করতে হবে।

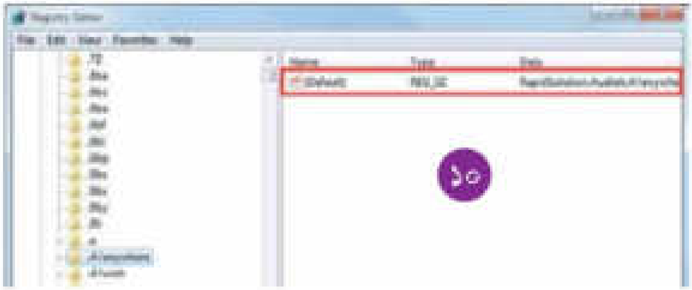

১২. সবশেষে কীবোর্ডের F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে ঐ নামের ফাইলগুলো মুছে দিতে হবে। এভাবেই সম্পূর্ণ হবে পুরো সফটওয়্যার ডিলিট করার প্রক্রিয়া।

দলগত কাজ

আনইনস্টল এবং ডিলিটের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে উপস্থাপন কর।

তথ্যের নিরাপত্তা ও সাইবার ঝুঁকি

বর্তমান সময়ে তথ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তথ্যের প্রবেশাধিকারের বিবেচনায় উন্মুক্ত তথ্য ও গোপনীয় তথ্য নামে তথ্যের দুটি প্রকারভেদ রয়েছে। উন্মুক্ত তথ্যে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং সীমাবদ্ধতা ছাড়াই যে কেউ শেয়ার করতে পারে। যেমন: সংবাদ, প্রবন্ধ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রেস রিলিজ ইত্যাদি। এটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি হওয়ায় এটির জন্য তেমন কোনো জটিল সুরক্ষার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, গোপনীয় তথ্য অনুমোদিত ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আইনি বাধ্যবাধকতা দ্বারা সুরক্ষিত। যেমন: বাণিজ্যিক চুক্তি, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি। অনুমতি ছাড়া গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করলে আইনি জটিলতায় পরতে হতে পারে অথবা আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা লাগতে পারে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। এখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে তথ্য যোগাযোগ, হিসাব-নিকাশ এবং অটোমেশনের মতো কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস এবং সিস্টেমকে বোঝায় যা বাইনারি আকারে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রেরণ করতে পারে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির এই প্রসারের ফলে, বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের মাধ্যমে তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছে। সাইবার জগৎ হলো একটি ডিজিটাল স্থান যেখানে মানুষ একে অপরের সাথে

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে এবং তথ্য পেতে পারে। এটি বাহ্যিক জগতের সমান্তরাল এমন একটি জগৎ যা ইন্টারনেট, ডেটা এবং কোড দ্বারা গঠিত। সাইবার জগৎ ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান এবং বিকশিত হচ্ছে এবং এটি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে।

সাইবার অপরাধ

আমরা জানি সমাজ ও আইনবিরোধী যে কোনো কর্মকাণ্ডই অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে যেসব অপরাধ অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে হয়ে থাকে সেগুলোকে সাইবার অপরাধ বলে। সাইবার অপরাধ সংঘটনে কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস এবং ইন্টারনেট অবশ্যই ব্যবহৃত হয় আবার কখনো কখনো ডিভাইস বা নেটওয়ার্ক নিজেই সাইবার আক্রমণের শিকার হয়। সাইবার অপরাধীরা আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে আমাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলতে পারে। তাই সাইবার অপরাধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিষয়ক ঝুঁকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার উপায় সম্পর্কে জানা আমাদের সকলের জন্য অতীব জরুরি। ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ রয়েছে, যার মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হয়। নিচে কিছু সাইবার অপরাধ উল্লেখ করা হলো।

- হ্যাকিং (Hacking)
- ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক (Brute Force Attack)
- ডেটা ইন্টারসেপশন (Data Interception)
- ডি ডস অ্যাটাক (DDos Attack)
- কম্পিউটার ম্যালওয়্যার (Computer Malware) ইত্যাদি।

হ্যাকিং (Hacking)

সাধারণত অনুমতি ব্যতীত কোনো ওয়েবসাইট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে তা ব্যবহার করা অথবা তার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়াকে হ্যাকিং বলে। যে হ্যাকিং করে তাকে হ্যাকার (hcaker) বলে। হ্যাকিং বৈধ ও অবৈধ হতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের সিস্টেমের সিকিউরিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হ্যাকার নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ প্রাপ্ত হ্যাকারদের কাজকে বৈধ হ্যাকিং বলে। এরা সিস্টেম সিকিউরিটি চেক করে; তবে সিস্টেমের কোন ক্ষতি করে না। যেমন- UNIX সিস্টেম চেক করার জন্য অনেক বৈধ হ্যাকার রয়েছে। এদেরকে হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার বলা হয়। অবৈধভাবে যারা হ্যাকিং করে তাদেরকে ক্রেকার (craker)ও বলে। অবৈধ হ্যাকার বা ক্রেকাররা ইন্টারনেট এবং অন্যান্য নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ডেটা চুরি অথবা নষ্ট করে দেয়। এদের কাছে সাধারণত বেশ কিছু টেকনিক থাকে যা ব্যবহার করে এরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সফটওয়্যার সিস্টেমের দুর্বলতা খুব সহজে খুঁজে বের করে পাসওয়ার্ড জেনে ফেলে। ফলে সহজেই ক্ষতি সাধন করতে পারে। এদেরকে ব্লাক হ্যাট হ্যাকার বলে।

হ্যাকিং অপরাধের প্রবণতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়। হ্যাকাররা অন্যের ই-মেইল দেখতে পারে, ওয়েব সার্ভারে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে অথবা নেটওয়ার্কে ফাইল চুরি করতে পারে।

ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক (Brute Force Attack)

বাস্তব জীবনে একজন চোর যেমন একটি তালাবদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করার জন্য বিভিন্ন রকম চাবি দিয়ে সেই তালা খোলার চেষ্টা করে তেমনি ডিজিটাল মাধ্যমে অপরাধীরা মানুষের বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট যেমন ব্যাংক, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইমেইল অ্যাকাউন্ট, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইসেও অবৈধভাবে প্রবেশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং ঐ গুলো নিয়ে একের পর এক অনুমান নির্ভর চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তারা সফলও হয় এবং সফল হলে তারা ঐ ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে। ঐ চুরি করা ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে থাকে। এটি এক ধরনের সাইবার আক্রমণ যা অবশ্যই একটি গুরুতর সাইবার অপরাধ। এই ধরনের সাইবার হামলা ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক (Brute Force Attack) নামে পরিচিত।

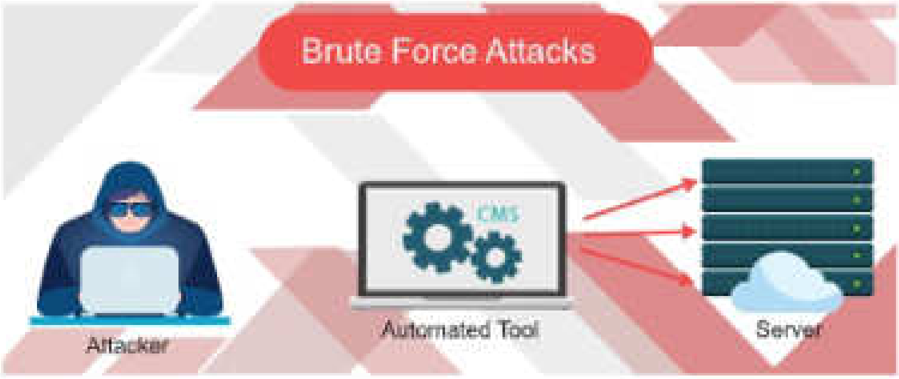

এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একজন আক্রমণকারী কোন সিস্টেমে অননুমোদিত অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত পাসওয়ার্ড বা এনক্রিপশন কি-গুলোর বিভিন্ন সংমিশ্রণ নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে চেষ্টা করে। এটি ট্রায়াল এবং এরর (trial and error) এর উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে সঠিকভাবে প্রতিটি বিকল্প খুঁজে সফল না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়।

এটি প্রতিরোধ করার জন্য কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী পাসওয়ার্ড বা অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এটি কার্যকর হতে পারে।

ডেটা ইন্টারসেপশন (Data Interception)

কৃষিকাজের জন্য জমিতে পানি সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত পানির পাম্প থেকে জমি বা ক্ষেত-এ নালা করে অথবা পাইপের সাহায্যে পানি দেওয়া হয়। এই নালা বা পাইপের মাঝপথে যদি কেউ তা কেটে দেয় অথবা পানির পাইপটি ফুটো করে দেয়, তাহলে যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাবে না। এর ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাঝপথে পানি অসৎ উপায়ে যেন কেউ না নিতে পারে তার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা করতেহবে। ঠিক একইভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের সময় প্রাপক এবং প্রেরকের মধ্যবর্তী কেউ তা আড়ি পেতে চুরি করতে পারে। এই চুরি হবার প্রক্রিয়াটি ডেটা ইন্টারসেপশন নামে পরিচিত।

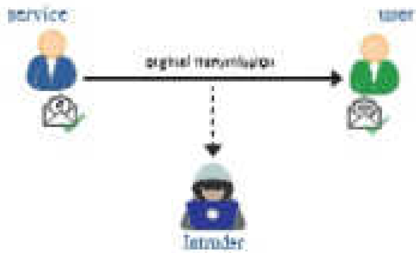

সাধারণত সফটওয়্যার বা অ্যাপস-এ এন্ড টু এন্ড ডেটা এনক্রিপশন করা থাকলে, মধ্যবর্তী কারও পক্ষে তথ্য (ম্যাসেজ, ছবি, ভিডিয়ো, ভয়েস কল রেকর্ড, ডকুমেন্ট ইত্যাদি) চুরি করা অসম্ভব হয়ে যায়। এনক্রিপশন (Encryption) হলো মেসেজ, ডেটা বা তথ্যকে এনকোড করার এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যা অনুমোদনহীন কেউ পড়তে বা বুঝতে পারে না। এর ফলে অনুমোদনহীনদের কাছে মেসেজ, ডেটা বা তথ্য দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। নেটওয়ার্কের পাবলিক পথ দ্বারা যে সকল গোপনীয় ডেটা স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে সাধারণত বিশেষ কোডের মাধ্যমে এনক্রিপ্ট করে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা বা সিকিউরিটির জন্য ডেটাকে এনক্রিপ্ট করা হয়।

ডি ডস আক্রমণ (DDoS-Distributed Denial of Service)

কোনো ব্যক্তি যখন টিভিতে সাক্ষাৎকার দেয় তখন অনেকেই যদি একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন ওই ব্যক্তিকে করেন তবে ওই ব্যক্তির পক্ষে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে কথা বলা কঠিন হয় এবং এতে সময়ক্ষেপণও হয়। কারণ তিনি কোনটি রেখে কোনটি বলবেন তার খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। ঠিক একইভাবে ডিজিটাল জগতে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়েল অফ সার্ভিস বা ডি ডস আক্রমণ হলো একই সময়ে একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট টার্গেটে আক্রমণ করা।

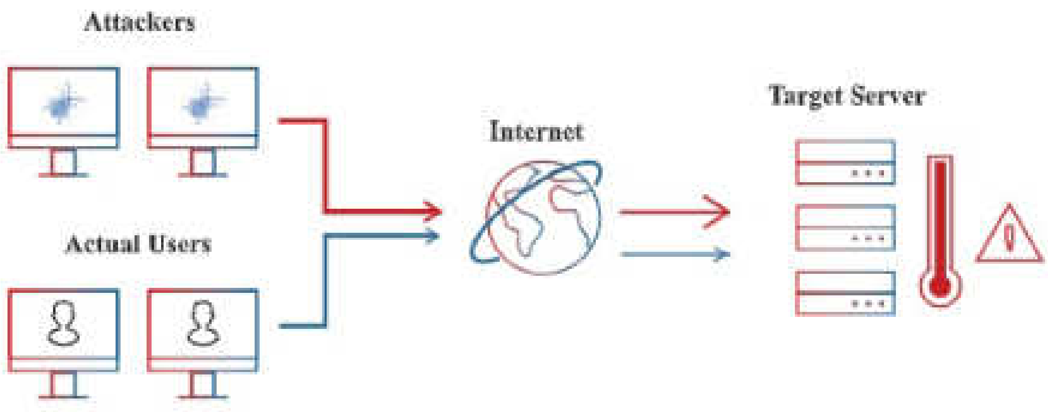

DDoS আক্রমণে একাধিক কম্পিউটার বা ডিভাইস কোনো ওয়েবসাইট বা অনলাইন সেবাকে প্রচুর পরিমাণে ট্র্যাফিকের সাথে প্লাবিত করতে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে এটি ধীরগতির হয়ে যায় বা ক্রাশ (crash) হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য হল সিস্টেমটিকে মোহাবিষ্ট করা যাতে প্রকৃত ব্যবহারকারীরা এটি অ্যাক্সেস বা ব্যবহার করতে না পারে।

২০২৫

ম্যালওয়্যার (malware) হলো ইংরেজি Malicious Software এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মোবাইল, কম্পিউটার, সার্ভার, ওয়েবসাইট অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষতি করার জন্য ডিজাইন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এমন সফটওয়্যারকে ম্যালওয়্যার বলে।

এই সফটওয়্যার মোবাইল, কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহারকারী স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। তবে যদি কোনো সফটওয়্যার তার অক্ষমতার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কম্পিউটার সিস্টেমে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে তাকে ম্যালওয়্যার বলা চলে না; একে সফটওয়্যার বাগ্ (bug) বলা হয়।
ম্যালওয়্যার এমন এক জাতীয় ক্ষতিকর সফটওয়্যার যা কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্য কোনো ডিজিটাল সিস্টেমের স্বাভাবিক কাজকে ব্যাহত করতে, গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে, কোনো সংরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে বা অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন দেখাতে ব্যবহার করা হয়। ম্যালওয়্যার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা- কম্পিউটার ভাইরাস (computer viruses), ওয়ার্ম (worms), ট্রোজান হর্স (trojan horses), স্পাইওয়্যার (spyware), র‍্যানসামওয়্যার (ransomware), অ্যাডওয়্যার (adware), রুটকিটস্ (rootkits) ও স্প্যামিং (spamming) ইত্যাদি।

সাইবার বুলিং (Cyber bullying)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোনো কিছু করতে বাধ্য করাকে সাইবার বুলিং বা সাইবার সন্ত্রাস বলা হয়। কাউকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা, হুমকি প্রদান করা, আতঙ্ক সৃষ্টি করা, অনুমতি ব্যতীত কারো ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা, সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ করা বা গুজব ছড়ানো, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ছড়ানো এসব কিছুই সাইবার সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত।

সাইবার সন্ত্রাসের জন্য মোবাইল, কম্পিউটার, ট্যাবলেট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট, ম্যাসেজ, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ই-মেইলে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিব্রতকর ছবি, ভিডিয়ো, আপত্তিকর বা অপমানজনক মন্তব্য দ্বারা ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় করা হয় এবং ব্যক্তিগত জীবনকে বিপর্যস্ত করা হয়।
সাধারণত শিশু এবং কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে সাইবার সন্ত্রাস বেশি ঘটে থাকে। এর ফলে যেমন তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনই তাদের ভেতর হীনমন্যতা বোধ, হতাশা, আতঙ্ক এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমে বা ওয়েবসাইটে কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য প্রকাশ করার পর তা মুছে ফেলা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব। আবার ফেইক আইডির ক্ষেত্রে এর উৎস বা প্রকাশকারীর পরিচয় খুঁজে বের করাও অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদেরও বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ফেইক নিউজ

সংবাদ হিসেবে উপস্থাপিত কোনো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিক তথ্য যা মানুষকে প্রতারিত করা বা মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাই-ই ফেইক নিউজ। এটি সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট গল্প বা বিকৃত তথ্যের রূপ নিতে পারে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট বা অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা বা একটি নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা প্রচার করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহারের এই যুগে, ফেইক নিউজ বিস্তার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘটা ফেইক নিউজের ফলে পৃথিবীব্যাপী অনেক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। 'চিলে কান নিয়ে গেছে' এমন সংবাদে চিলের পিছে না দৌড়ে সবার আগে কানে হাত দিয়ে দেখা উচিত। ঠিক একইভাবে অনলাইনে কোনো পোস্ট বা খবর দেখলে তা যাচাই করে বিশ্বাস করা উচিত। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নকল অর্থাৎ ছদ্ম নাম ধারণ করে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা খবর বা গুজব রটিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ মোতাবেক সাইবার বুলিং এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেইক নিউজ ছড়ানোর জন্য অপরাধীর সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে অথবা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা

সাইবার আক্রমণের শিকার হলে নিচের কাজগুলো করা যেতে পারে। যথা-

১। যত দ্রুত সম্ভব ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯, ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯ অথবা আইসিটি হেল্পলাইন-এ যোগাযোগ করতে হবে।

২। প্রযুক্তিতে দক্ষ এমন কারোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৩। প্রমাণক সহ www.rab.gov.bd ওয়েবসাইটে অভিযোগ পাঠাতে হবে।

৪। পিতা-মাতা বা পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে।

৫। ডিজিটাল ডিভাইস বন্ধ করে রাখতে হবে।

৬। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)-বরাবর লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে।

৭। বিষয়টি অপরিচিত কারো সাথে বা উন্মুক্তভাবে সবার সাথে শেয়ার করা যাবে না।

৮। নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি বা জিডি করতে হবে।

৯। ভোক্তা অধিকারের চর্চা করতে হবে।

১০। অপরাধের প্রমাণগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

আমরা এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে তা নিজের মধ্যে না রেখে মা-বাবা এমনকি শিক্ষককে জানিয়ে খুব দ্রুতই নিকটস্থ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করব। আমাদের দেশে এখন অনলাইনেই জিডি বা সাধারণ ডায়েরি করা যায়। এ জন্য আমাদের যে কোনো ইন্টারনেট ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে https://gd.police gov.bd লিখে সার্চ করতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট যেমন: র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), কাউন্টার টেররিজম ইউনিট (সিটিইউ), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) এবং মেট্রোপলিটন পুলিশসহ প্রায় সকল ইউনিটের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (অ্যাপ) যেমন- Report to RAB, Hello CT App ইত্যাদি প্লেস্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিজের মোবাইলে রেখে বিপদের সময় অপরাধ দমনে কাজে লাগাতে পারি। সাইবার জগতে কেউ দুর্ঘটনার শিকার হলে নিকটস্থ থানায় জিডি করে জিডির কপি এবং নিচের তথ্যগুলো সহ Hello CT (Counter Terrorism) বা Report to RAB অ্যাপ্লিকেশনে অপরাধের তথ্য পাঠাতে হবে অথবা জিডির কপিসহ নিকটস্থ থানার সাইবার ক্রাইম হেল্পডেস্কে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।

ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপত্তা কৌশল

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য এবং অনলাইন হুমকি থেকে ব্যক্তিগত তথ্য এবং ডিভাইসমূহকে রক্ষা করার জন্য নিচের নিরাপত্তা কৌশলগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা-

- টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন (2FA) চালু করা।
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং সকল ডিজিটাল প্লাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা।
- কম্পিউটার সফটওয়্যার ও মোবাইল আপ্লিকেশন সফটওয়্যার (apps) গুলো নিয়মিত আপডেট করা।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য কিংবা গোপনীয় তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা।
- ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য (পিন কোড বা পাসওয়ার্ড) কারো সাথে শেয়ার না করা।
- ডিভাইসে অ্যান্টিভাইরাস এবং ফায়ারওয়াল সুরক্ষা ইনস্টল করা।

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন (2FA)

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন-এর অর্থ হচ্ছে যখন আমরা আমাদের ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য অনলাইন অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করি তখন একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড যা ৬ ডিজিটের হয়ে থাকে) আমাদের ফোনে বা মেইলে আসে। আমরা যখন সেই ওটিপি সঠিকভাবে দেই তখনই কেবল আমরা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারি, অন্যথায় নয়। OTP সীমিত সময়ের জন্য পাঠানো হয়। একবার ব্যবহার করার পরে OTP এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে একই OTP আর ব্যবহার করা যায় না। টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন চালু থাকলে সাইবার অপরাধীর পক্ষে কোনো অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা বেশ কঠিন হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে এবং বিনোদনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাবহার করে থাকি। তবে আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা কোন কোন ব্যক্তিগত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করব এবং কোনগুলো করব না। হ্যাকাররা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডকৃত বিভিন্ন কনটেন্ট এর সূত্র ধরে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে কোনো প্রতারণার মাধ্যমে আমাদের অর্থসম্পদ হাতিয়ে নিতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে।

শিক্ষক ব্যবহারিক ক্লাশে শিক্ষার্থীদের টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন (2FA) চালু করার ধাপগুলো দেখাবেন।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি

আসক্তি বলে একটা ভীতিকর শব্দ আছে এবং সবাই নিশ্চয়ই এর সাথে পরিচিত। সাধারণত আসক্তি শব্দটা ব্যবহৃত হয় মাদকের সাথে। কোনো একজন ব্যক্তি মাদকে আসক্ত হয়ে গেলে তার জীবনটা কেমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসা কত কঠিন আমরা সবাই সেটা জানি। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির পাঠ্যবইয়ে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারের মতো এমন চমৎকার একটা বিষয়ের সাথে আসক্তির মতো ভয়ংকর একটা নেতিবাচক শব্দ কেমন করে জুড়ে দেওয়া হলো সেটি নিয়ে তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ। তোমাদের ভেতর যাদের কম্পিউটার আছে, তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে কম্পিউটার গেম খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ, খেলা বন্ধ করে যখন অন্য একটা জরুরি কাজ করা দরকার তখনো খেলা ছেড়ে উঠতে পারছ না, এরকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কারো কারো হয়েছে। যাদের কম্পিউটারে ইন্টারনেটের যোগাযোগ আছে তাদের কারো কারো হয়ত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই ফেসবুকে তুমি সম্ভবত নিজের সম্পর্কে কোনো তথ্য দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছ কখন সেখানে কেউ লাইক দেবে। ফেসবুকে তোমার বন্ধু বাড়লে তুমি হয়ত আনন্দ পেয়েছ এবং ঠিক কম্পিউটার গেমের মতোই ফেসবুক নামে সামাজিক নেটওয়ার্কে তোমার যতটুকু সময় দেওয়া উচিত তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক বেশি সময় দিয়েছ। এটা হয়ত খুব অস্বাভাবিক নয় যে তুমি যদি ফেসবুকে এত সময় না দিতে তাহলে তোমার পরীক্ষার ফল আরেকটু ভালো হতো। তুমি আরও কয়েকটা চমৎকার বই পড়তে পারতে। মাঠে আরও একটু বেশি খেলতে পারতে। ভাই-বোন, বাবা-মাকে আরেকটু বেশি সময় দিতে পারতে।

তোমাদের অনেকে কম্পিউটার গেম কিংবা ফেসবুকের মতো কোনো একটা সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় কর। এতে সত্যিকারের জীবনের খানিকটা হলেও ক্ষতি করছ যারা এমনটি করছ তারা নিশ্চয়ই এখন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট নামে ইতিবাচক শব্দটির সাথে আসক্তি নামের নেতিবাচক শব্দটা জুড়ে দেওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছ! আসক্তি বলতে বোঝানো হয় যখন কেউ জানে কাজটি করা ঠিক হচ্ছে না তারপরও সেই কাজটি না করে থাকতে পারে না। মাদকের জন্যে এটি যেমন হতে পারে ঠিক সেরকম কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও সেটি হতে পারে। মাদক যেমন জীবনের জন্য ক্ষতিকর, বাড়াবাড়ি করা হলে কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেটও সে রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কম্পিউটার গেমে আসক্তি

কম্পিউটার গেমে আসক্তিটা প্রায় সময়েই শুরু হয় শৈশব থেকে এবং বেশিরভাগ সময়ই সেটা ঘটে অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে। কম্পিউটার একটা tool এবং এটা দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তি সম্পর্কে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছে যে অনেক সময়ই অভিভাবকরা ধরে নেন এটা দিয়ে যা কিছু করা হয় সেটাই বুঝি ভালো, তাই যখন তারা দেখেন তাদের সন্তানেরা দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তারা বুঝতে পারেন না তার মাঝে সতর্ক হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন এবং এই বিনোদনের নানা রকম মাত্রা রয়েছে। যারা সেটি

খেলছে তারা সেটাকে নিছক বিনোদন হিসেবে নিয়ে মাত্রার ভেতরে ব্যবহার করলে সেটি যেকোনো সুস্থ বিনোদনের মতোই হতে পারে। কিন্তু প্রায় সময়ই সেটি ঘটে না। দেখা গেছে একটি ছোটো শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাই কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যেতে পারে। কোরিয়ায় একজন মানুষ টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, চীনের এক দম্পতি কম্পিউটার গেম খেলার অর্থ জোগাড় করতে তাদের শিশু সন্তানকে বিক্রয় করে দিয়েছিল। এই উদাহরণগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যাওয়া মোটেও বিচিত্র কিছু নয় এবং একটু সতর্ক না থাকলে একজন খুব সহজেই আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

কম্পিউটার কিংবা কম্পিউটার গেমে আসক্তির বিষয়টা যেহেতু নতুন, তাই সেগুলো নিয়ে গবেষণা এখনো খুব বেশি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে পুরো বিষয়টি নিয়ে গবেষকরা আরও নিশ্চিতভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন। এখনই গবেষণায় দেখা গেছে কোনো একটা কম্পিউটার গেমে তীব্রভাবে আসক্ত একজন মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ উত্তেজক রাসায়নিক দ্রব্যের আবির্ভাব হয়। শুধু তাই নয় যারা সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন টানা দশ ঘণ্টা করে কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের মস্তিষ্কের গঠনেও এক ধরনের পরিবর্তন হয়ে যায়।

কাজেই কম্পিউটার গেম চমৎকার একটা বিনোদন হতে পারে– কিন্তু এতে আসক্ত হওয়া খুব সহজ এবং তার পরিণতি মোটেও ভালো নয়, সেটা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং মানুষের নিজেদের ভেতর সবসময়েই একধরনের সামাজিক যোগাযোগ ছিল– কিন্তু ইদানীং সামাজিক যোগাযোগের কথা বলা হলে সেটি মানব সভ্যতার সেই চিরন্তন সামাজিক যোগাযোগ বা সামাজিক নেটওয়ার্কের কথা না বুঝিয়ে ইন্টারনেট-নির্ভর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের নেটওয়ার্কের কথা বোঝানো হয়। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, টিকটক, লাইকি– এ ধরনের অনেক সামাজিক যোগাযোগ সাইট রয়েছে যেগুলোতে মানুষ নিজেদের পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। এক সময় এই সাইটগুলো ছিল কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের জন্যে, এখন সব বয়সী মানুষই সেটি ব্যবহার করে। শুধু যে একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্যে এটি ব্যবহার করে তা নয়, একটা বিশেষ আদর্শ বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও এটি ব্যবহার করা হয়। যে উদ্দেশ্যে এটি শুরু হয়েছিল যদি এটি সেই উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এটি কোনো সমস্যার জন্ম দিত না, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর জন্যেই একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে শুরু করছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং এখন এটি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত বলা যায় এই সাইটগুলোর সাফল্য নির্ভর করে, সেগুলো কত দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের আসক্ত করতে পারে। পুরো কর্মপদ্ধতির মাঝেই যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে কত বেশিবার এবং কত বেশি সময় একজনকে এই সাইটগুলোতে টেনে আনা যায় এবং তাদেরকে দিয়ে কোনো একটা কিছু করানো যায়। যে যত বেশিবার এই সাইট ব্যবহার করবে সেই সাইটটি তত বেশি সফল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অবশ্যই সেটি তত বেশি টাকা উপার্জন করবে। কাজেই কেউ যদি অত্যন্ত সতর্ক না থাকে তাহলে তার এই সাইটগুলোতে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে যাবার খুব বড়ো একটা আশঙ্কা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানীরা এই সাইটগুলো বিশ্লেষণ করে আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আবিষ্কার করেছেন। সব মানুষের ভেতরেই নিজেকে প্রকাশ করার একটা ব্যাপার রয়েছে কিংবা নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার এক ধরনের

সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় narcissism বলে– সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে মানুষের এই সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে দেয়। সবার ভেতরই তখন নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জেনে হোক না জেনে হোক ব্যবহারকারীরা নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি তথ্য সবার সামনে উপস্থাপন করতে থাকে, কেউ সেটি দেখলে সে খুশি হয়, কেউ পছন্দ করলে আরও বেশি খুশি হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকটা আসক্তির মতো কাজ করে এবং একজন ব্যবহারকারী ঘন্টার পর ঘন্টা এই যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সময় অপচয় করতে থাকে। সামাজিক যোগাযোগের এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে সারা পৃথিবীতে অনেক সময়ের অপচয় হচ্ছে।

আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায়

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি মাদকের ন্যায় কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটেও আসক্তি হতে পারে। তাই মাদকে আসক্তির জন্যে যা যা সত্যি, কম্পিউটার গেম বা সামাজিক যোগাযোগের সাইটে আসক্তির জন্যেও সেগুলো সত্যি। তাই আমরা বলতে পারি একবার আসক্ত হয়ে যাবার পর সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা থেকে কখনোই আসক্ত না হওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। যারা এই আসক্তির ব্যাপারটি জানে না তাদের পক্ষে আসক্ত হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তোমরা যারা এই লেখাগুলো পড়ছ, তারা নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে যেন সহজেই আসক্ত না হয়ে যাও।

কম্পিউটার গেম এক ধরনের বিনোদন, কাজেই যারা কম্পিউটার গেম খেলবে তাদেরকে জানতে হবে অন্য যেকোনো বিনোদনের জন্যে যেটা সত্যি কম্পিউটার গেম খেলার বেলাতেও সেটা সত্যি। কম্পিউটার এক ধরনের প্রযুক্তি। তাই অনেকেই কম্পিউটার ব্যবহার করে করা যেকোনো কাজকেই প্রযুক্তির এক ধরনের ব্যবহার বলে মনে করে, সেটা মোটেও সত্যি নয়। কম্পিউটার গেম খেলে মোটেও কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান হয় না, খেলার আনন্দটা হয়। কাজেই কখনোই কম্পিউটার গেম খেলার কারণে নিজের দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

আশা করা যাচ্ছে তোমরা কখনো কম্পিউটার গেমে আসক্ত হবে না, ঠিক সেরকম তোমাদের চারপাশে যারা আছে তাদেরকেও কম্পিউটার গেমে আসক্ত হতে দেবে না। যারা কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যায়, তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে। যেমন তাদের মাথায় সার্বক্ষণিক শুধু সেই গেমটার ভাবনাই খেলা করে, যখনই তারা সেই গেমটি খেলতে বসে তাদের ভেতরে এক ধরনের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ভর করে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। জোর করে তাদেরকে এই খেলা থেকে বিরত রাখা হলে তাদের শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, অনেক কষ্ট করে এই আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া গেলেও হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে আবার সেই আসক্তি ফিরে আসতে পারে। যারা কোনো কারণে কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে যায় তারা যদি এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে সবার আগে নিজের কাছে স্বীকার করে নিতে হবে যে তাদের আসক্তি জন্মেছে। তারপর তাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী তার একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকায় কম্পিউটার গেমের জায়গাটুকু কোথায় সেটি নিজেকে বোঝাতে হবে। তার জীবনের সমস্যাগুলোরও একটা তালিকা করতে হবে। সেই তালিকার সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটি কম্পিউটার গেমের কারণে হয়েছে সেটাও নিজেকে বোঝাতে

২০২৫

হবে। তারপর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ লেখাপড়া, হোমওয়ার্ক, মাঠে খেলাধুলা, extra curricular activities, পরিবারের সাথে সময় কাটানো, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ সবকিছুর জন্যে সময় ভাগ করে রাখতে হবে। সেই সব কিছু করার পর যদি কোনো সময় পাওয়া যায় শুধু তাহলেই কম্পিউটার গেম খেলবে বলে ঠিক করে নিতে হবে। ধীরে ধীরে কম্পিউটার গেমে সময় কমিয়ে এনে নিজেকে অন্যান্য সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

যারা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্ত হয়ে গেছে তাদের বেলাতেও আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে একইভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে নিজেকে বোঝাতে হবে এই ধরনের সাইটে অতিরিক্ত সময় দেওয়া আসলে এক ধরনের আসক্তি। প্রত্যেকবার যখন সামাজিক যোগাযোগ সাইটে কিছু একটা দেখতে ইচ্ছা করবে তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে সত্যি কি তার প্রয়োজন আছে? যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে নিজেকে নিবৃত্ত করতে হবে। প্রত্যেকবার যোগাযোগ সাইটে ঢুকলে সেখানে কতটুকু সময় দেওয়া হয়েছে সেটা কোথাও লিখে রাখতে হবে। দিনে কত ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়, সপ্তাহে কত ঘণ্টা, মাসে কত ঘণ্টা সেটা হিসাব করে সেই সময়টাতে সত্যিকারের কোনো কাজ করলে কতটুকু কাজ করা যেত সেটা নিজেকে বোঝাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্তি কমাতে হলে সেখান থেকে যোগাযোগের প্রয়োজন নেই এমন মানুষদের কাটছাঁট করে সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। অন্য সব কাজ শেষ হওয়ার পর সময় থাকলেই এই সাইটে ঢোকা যাবে- এটি নিজেকে বোঝাতে হবে। পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট-এর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সাইট deactivate করে ফেলার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে অভ্যস্ত করে আসক্তিটুকু কমাতে কমাতে এক সময় পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে।

মনে রাখতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সেই মুহূর্তগুলো সত্যিকার কাজে ব্যয় না করে কোনো একটি আসক্তির পেছনে ব্যয় করা খুব বড়ো অপরাধ!

পাইরেসি

লেখক, শিল্পীসহ সৃজনশীল কর্মীদের তাদের নিজেদের সৃষ্টকর্মকে সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া কপিরাইট আইনের লক্ষ্য। সাধারণভাবে, একটি মুদ্রিত পুস্তকের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা যথেষ্ট ঝামেলাপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু কম্পিউটারের বেলায় যেকোনো কিছুর 'কপি' বা 'অবিকল প্রতিলিপি' তৈরি করা খুবই সহজ কাজ। এজন্য এমনকি বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কম্পিউটার সফটওয়্যার, কম্পিউটারে করা সৃজনশীল কর্ম যেমন ছবি, এনিমেশন ইত্যাদির বেলায় কপিরাইট সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। যখনই এরূপ কপিরাইট আইনের আওতায় কোনো কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় তখনই কপিরাইট বিঘ্নিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি নামে অভিহিত করা হয়।

কপিরাইট আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, নির্মাতা বা প্রোগ্রামার তাদের কম্পিউটার সফটওয়্যারের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করতে পারেন। ফলে, তাদের অনুমতি ব্যতীত ওই সফটওয়্যারের প্রতিলিপি করা বা সেটির পরিমার্জন করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়। ফলে, কপি বা নতুন সৃষ্টির আইনগত ভিত্তি আর থাকে না। কম্পিউটার সফটওয়্যারের পাইরেসি সোজা হলেও বিশ্বব্যাপী পাইরেসির প্রকোপ খুব বেশি একথা বলা যায় না। বড়ো বড়ো সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তাদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার জন্য বিজনেস সফটওয়্যার এলায়েন্স (BSA) নামে একটি সংস্থা তৈরি

করেছে। সংস্থাটির ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই পাইরেসিযুক্ত। যেহেতু সফটওয়্যার পাইরেসি খুবই সহজ, তাই এর হিসাব করাটা কঠিনই বটে। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা

কপিরাইট আইন সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সৃষ্টকর্মের ওপর 'মালিকানা' বা স্বত্বাধিকার দেয়। ফলে, কোনো সৃষ্টকর্মের বাণিজ্যিক মূল্য থাকলে সেটি তার স্রষ্টাই পান, অন্যরা নন। যেহেতু প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অর্থ প্রয়োজন, সেহেতু কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সফটওয়্যার নির্মাতা, ওয়েবসাইট ডিজাইনকারী সবারই অর্থের প্রয়োজন। তারা তাদের সৃজনশীল কর্ম সৃষ্টির জন্য পরিশ্রম, মেধা এবং কখনো কখনো অর্থও বিনিয়োগ করেন। কাজেই, সৃষ্টকর্ম বিক্রি বা বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁকে তার বিনিয়োগের সুফল তুলতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকেই। কপিরাইট আইনের আওতায় প্রাপ্ত আইনগত অধিকার তাদের সেই সুবিধাই দেয়।

যদি কোনো শিল্পী বা প্রোগ্রামার দেখতে পান যে, তার দীর্ঘদিনের শ্রম ও মেধার ফসল অন্যরা কোনোরূপ স্বীকৃতি বা বিনিময় মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ছাড়া উপভোগ বা ব্যবহার করছে তাহলে তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। কপিরাইট আইনের কার্যকারিতা সৃজনশীল কর্মীদের এই নিরুৎসাহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

তথ্য অধিকার ও নিরাপত্তা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার (right to information) আইন প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নামে একটি আইন চালু হয়েছে। এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পেরিক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আইনে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংস্থাসমূহকে তথ্য সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফলে জনগণের যেকোনো বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

এই আইনের ফলে অনেকের পক্ষে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল তথ্যের গোপনীয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত, সে সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রকাশকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। যেমন ধরা যাক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র প্রকাশের জন্য কোনো সংস্থাকে এই আইনের আওতায় বাধ্য করা হলে তা সম্পূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। এ কারণে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা তথ্য অধিকার আইন সংরক্ষণ করে। একইভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কৌশলগত, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক ২০২৫

তথ্য প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকল তথ্য গোপন রাখাটা এই আইনের লঙ্ঘন নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যদি কোনো তথ্য প্রকাশ করা হলে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়, তাহলে তা এ আইনের আওতায় প্রকাশযোগ্য নয়।

সাধারণ ট্রাবলশুটিং

ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করবে অথচ কখনো সেটি বিগড়ে যায়নি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেনি এমন অভিজ্ঞতার মানুষ পৃথিবীতে বিরল। কিছু কিছু সমস্যা খুবই সাধারণ আবার কিছু সমস্যা জটিল। সাধারণ সমস্যাগুলো অনেক সময় ব্যবহারকারীরাই ঠিক করে ফেলতে পারে। জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারও মাধ্যমে ঠিক করাতে হয়। কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। তোমরা যারা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার কর তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ প্রত্যেকটি যন্ত্রের সাথে একটি করে ম্যানুয়াল বা ব্যবহার নির্দেশিকা থাকে। এ নির্দেশিকার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর শেষদিকে এক বা দুটি পৃষ্ঠা থাকে যার শিরোনাম হলো ট্রাবলশুটিং। ট্রাবলশুটিং অংশে সাধারণ সমস্যার প্রকৃতি ও এর সমাধান দেওয়া থাকে।

ট্রাবলশুটিং হচ্ছে সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। সাধারণত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় এবং পাশাপাশি সমাধান দেওয়া থাকে। ব্যবহারকারী তার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধান অনুসরণের মাধ্যমে বেশিরভাগক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।

মূলত ট্রাবলশুটিং হচ্ছে এমন কিছু যা, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে করতে হয়। অন্য যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের তুলনায় কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের ট্রাবলশুটিং একটু বেশিই প্রয়োজন হয়। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এ যন্ত্রগুলো আমরা অনেক বেশি সময় ধরে ব্যবহার করি। তাই আইসিটির ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সাধারণ ট্রাবলশুটিং সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে ট্রাবলশুটিং কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরের পৃষ্ঠায় কিছু ট্রাবলশুটিং নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ডেস্কটপ কম্পিউটারের কিছু সাধারণ সমস্যা ও সমাধান

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১.	সিস্টেম চালু হচ্ছে না	১. মেইন পাওয়ার ক্যাবলের সংযোগটি loose বা ঢিলে কিনা দেখতে হবে। ২. মেইন বোর্ডে পাওয়ার আসছে কিনা দেখতে হবে। ৩. মেইন বোর্ডে যদি পাওয়ার না আসে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পরিবর্তন করতে হবে। ৪. স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখতে হবে।
২.	সিস্টেম সঠিকভাবে চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।	১. মনিটরের বাতি জ্বলছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। যদি বাতি জ্বলে তাহলে মনিটরের ডেটা ক্যাবলটি পরীক্ষা করতে হবে এবং ক্যাবলটি খোলা বা লুজ থাকলে তা সঠিকভাবে লাগাতে হবে। ২. সিস্টেমটি বন্ধ কর এবং মেইন সিস্টেম থেকে পাওয়ার ক্যাবলটি খুলে ফেলতে হবে (সতর্কতার জন্য)। ৩. মেমোরি স্লট থেকে সকল র‍্যাম (Ram) সরিয়ে ফেল। ৪. একটি ইরেজার (rubber) দিয়ে র‍্যাম-এর কানেক্টরগুলোকে ঘষে পরিস্কার করতে হবে। ৫. শক্ত ব্রাশ দিয়ে সবগুলো র‍্যাম স্লটকে পরিস্কার করতে হবে। ৬. র‍্যাম ইনস্টল না করে কম্পিউটারটি চালু কর এবং কোনো beep সাউন্ড হয় কিনা খেয়াল করতে হবে। ৭. যদি beep সাউন্ড শুনতে পাও তবে কম্পিউটার বন্ধ করে র‍্যাম ইনস্টল করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। ৮. যদি কোনো beep সাউন্ড হয় তবে বুঝতে হবে র‍্যামটি সমস্যাযুক্ত। ৯. এবারও display না আসলে নতুন র‍্যাম লাগাতে হবে। ১০. র‍্যামকে প্রতিস্থাপন করে আবার চেক কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে display না হওয়ার কারণ র‍্যাম-এর সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে।
৩.	সিস্টেম অত্যন্ত গরম হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিকভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।	১. কেসিং টি খোল। ২. মাদারবোর্ড থেকে সতর্কতার সাথে CPU তথা প্রসেসর ফ্যানটি সরাতে হবে। কিন্তু প্রসেসর সরানো যাবে না। ৩. হয়ত দেখবে ভেতরে বা Heat sink-এ প্রচুর ধুলোবালি জমে আছে, যা বায়ু চলাচলকে বাধাগ্রস্থ করছে। ফলে CPU ঠান্ডা হতে পারছে না। ৪. Heat sink এবং ফ্যানটিকে ভালোভাবে পরিস্কার করে পুনরায় ইনস্টল কর। এবার কেবিনেটটি বন্ধ করে কম্পিউটারটি চালু করতে হবে। ৫. সমাধান না হলে স্থানীয় কোনো সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দেখাতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
৪.	কোনোরূপ উত্তপ্ত হওয়া ছাড়াই কম্পিউটারটি কয়েক মিনিট পরপর shutdown হয়ে যাচ্ছে।	১. সতর্কতার সাথে মাদারবোর্ডটি ভালো করে দেখে নাও। লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটির উপর থেকে খুলে আসছে এরূপ চোখে পড়ে কিনা খেয়াল কর। এক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরকে ভালো করে লাগিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। ২. খুব সতর্কতার সাথে চালু অবস্থায় কম্পিউটারটি খেয়াল কর কোনো IC বা কম্পোন্যান্ট অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করছে কিনা। তবে সাবধান, বোর্ডটা যেন shorted না হয়ে যায়। যদি তেমন হয় তবে মেরামতের জন্য তোমার নিকটস্থ সার্ভিস সেন্টারে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
৫.	উইন্ডোজ রান করার সময় আটকে বা হ্যাং/hang হয়ে যায়।	১. আপগ্রেড এন্টিভাইরাস চালিয়ে হার্ডডিস্কে কোনো প্রকার ভাইরাস আছে কিনা চেক করে ক্লিন করে নিতে হবে। ২. হার্ডডিস্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা অন্যত্র ব্যাকআপ নিয়ে হার্ডডিস্কের "C" ড্রাইভ ফরম্যাট করে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করানো ভালো।
৬.	পাওয়ার অন করলে display আসার পর কম্পিউটার hang হয়ে যায়।	১. **প্রথম ধাপ :** কম্পিউটারের পাওয়ার অফ কর এবং কেসিংয়ের একপার্শ্বে খুলে হার্ডডিস্ক, সিডিরম কিংবা ডিভিডি-এর সাথে সংযুক্ত ডাটা ক্যাবল এবং পাওয়ার ক্যাবলসমূহ সাবধানে খুলে ফেল এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখ। যদি সমস্যা থেকে যায় তাহলে– ২. **দ্বিতীয় ধাপ :** মাদারবোর্ড থেকে RAM, Processor, Power supply connection প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা ক্যাবল কানেকশনের সংযোগস্থলে লুজ আছে কিনা? এরপরও যদি একই সমস্যা থাকে তাহলে– ৩. **তৃতীয় ধাপ :** অন্য একটি ভালো কম্পিউটার থেকে প্রসেসর র‍্যাম, হার্ডডিস্ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এই মাদারবোর্ডে ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে মাদারবোর্ডটি ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তাহলে মাদারবোর্ড বদলিয়ে ফেলতে হবে। কাজটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে। নোট : অনেক সময় কেসিংয়ের পিছনে মাদারবোর্ডটির কীবোর্ড এবং মাউস পোর্টের সংযোগ লুজ থাকলেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংযোগ দিতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
৭.	কম্পিউটার ঘন ঘন হ্যাং করে বা রিবুট/রিস্টার্ট হয়ে যায়।	১. কম্পিউটারের সিপিইউর উপর সংযুক্ত কুলিং ফ্যানটি না ঘুরলে কিংবা পর্যাপ্ত ঠান্ডা করতে না পারলে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারের পাওয়ার অফ করে কেসিং খুলে কুলিং ফ্যানটিকে ভালোভাবে চেক করে প্রয়োজনে নতুন কুলিং ফ্যান স্থাপন করে নাও। এছাড়াও কম্পিউটার চলাকালীন তোমার সিপিইউর পিছনে কেসিং-এর ফ্যানটি ঘুরে কিনা তাও চেক করতে হবে। ২. কম্পিউটারে ভাইরাস থাকলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই আপগ্রেড এন্টিভাইরাস দ্বারা কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ড্রাইভের প্রতিটি ড্রাইভ ক্লিন করে নিতে হবে। এছাড়া অনেক সময় নতুন সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম লোড করার কারণেও এটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি আনইনস্টল করে দেখা যেতে পারে।
৮.	কম্পিউটারের মেটাল অংশে স্পর্শ বা হাত লাগলে শক্ করে।	১. কম্পিউটারের গায়ে তথা মেটাল অংশে স্পর্শ করলে যদি শক্ করে তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটারটি আর্থিং করা নেই। সেক্ষেত্রে একজন পারদর্শী ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা যথাযথভাবে আর্থিং করিয়ে নিতে হবে।
৯.	কম্পিউটারের তারিখ এবং সময় ঠিক থাকে না। অথবা বায়োসের কোনো অপশন পরিবর্তন করলে তা সেভ হয় না।	১. মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) এর ব্যাটারিটি কার্যক্ষমতা হারালে এটি ঘটে। এক্ষেত্রে একটি নতুন অনুরূপ ব্যাটারি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দিতে হবে।
১০.	Boot Disk Failure or Hard Disk Not Found মেসেজ দেখায়।	১. কম্পিউটারের পাওয়ার বন্ধ করে কেসিং খুলে মাদারবোর্ড এবং হার্ডডিস্ক ড্রাইভের সাথে সংযুক্ত ডেটা ক্যাবল এবং পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট থেকে হার্ডডিস্কে সংযুক্ত পাওয়ার ক্যাবলটির সংযোগস্থলে কোনো লুজ আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করে সঠিকভাবে কানেক্ট করতে হবে। ২. হার্ডডিস্কের পিছনের জাম্পার সেটিং ডায়াগ্রাম অনুসরণ করে ড্রাইভটির জাম্পার সেটিং ঠিক আছে কিনা তা দেখে সঠিকভাবে জাম্পার সেটিং করতে হবে। ৩. কম্পিউটার চালিয়ে বায়োসে প্রবেশ করে হার্ডডিস্ক ড্রাইভটিকে বায়োসের অপশন থেকে অটো কিংবা ম্যানুয়ালি ডিটেক্ট করে কিনা তা দেখ। যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে অন্য একটি ভালো কম্পিউটারে তোমার হার্ডডিস্কটিকে লাগিয়ে দেখ হার্ডডিস্কটি কাজ করে কিনা? যদি কাজ না করে তাহলে নিশ্চিন্তে অন্য একটি হার্ডডিস্ক ক্রয় করে কম্পিউটারের সাথে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ইনস্টল করে ফেল। কাজটি অবশ্যই অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে করাতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১১.	Out of Memory or Not Enough Memory মেসেজ দেখায়।	১. সাধারণত কম্পিউটারের অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে গিয়ে কিংবা একাধিক প্রোগ্রাম একসাথে ওপেন করে কাজ করতে গেলে এ ধরনের ম্যাসেজ প্রদর্শিত হয়। ২. কম্পিউটারে অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল করার মতো পর্যাপ্ত মেমোরি না থাকলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম ব্যবহার করতে হবে।
১২.	কীবোর্ড কাজ করছে না	১. কম্পিউটারটি বন্ধ করে কীবোর্ডটি পোর্টের সাথে যথাযথভাবে সংযোগ করা আছে কিনা সে বিষয়টি লক্ষ করতে হবে। ২. যদি সংযোগ না থাকে কিংবা লুজ থাকে তাহলে ভালোভাবে সংযোগ দিয়ে পুনরায় কম্পিউটার চালু করে দেখতে হবে। ৩. এন্টিভাইরাস দ্বারা ভাইরাস ক্লিন করে দেখতে হবে। ৪. এরপরও যদি কীবোর্ড কাজ না করে তাহলে নতুন কীবোর্ড লাগিয়ে নিতে হবে।
১৩.	মাউস ডিটেক্ট করে না কিংবা মাউস কাজ করে না	১. কম্পিউটারের সাথে মাউসের ক্যাবল সংযোগ ঠিক আছে কিনা দেখ এবং ভালোভাবে লাগিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। ২. পোর্ট পরিবর্তন করে দেখতে হবে। ৩. অন্য একটি ভালো মাউস পোর্টে লাগিয়ে দেখতে হবে। ৪. বায়োসে প্রবেশ করে দেখ মাউস ডিজ্যাবল করা আছে কিনা? যদি থাকে এনাবল করে দিয়ে সেভ করে বায়োস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ৫. এরপরও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে ভালো একটি মাউস লাগিয়ে নাও। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।
১৪.	মনিটরে কোনো পাওয়ার নেই।	১. পাওয়ার বোতাম (বা সুইচ) চালু আছে কিনা। ২. AC পাওয়ার কর্ডটি মনিটরের পেছনে এবং পাওয়ার আউটলেটে ভালোভাবে সংযুক্ত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।
১৫.	মনিটরের পাওয়ার অন/চালু কিন্তু পর্দায় কোনো ছবি নেই।	১. মনিটরের সাথে সরবরাহকৃত ভিডিও ক্যাবলটি কম্পিউটারের পেছনে মজবুতভাবে লাগানো হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। যদি ভিডিও ক্যাবলের অপর প্রান্তটি স্থায়ীভাবে মনিটরের সাথে যুক্ত না থাকে, তাহলে এটিকে দৃঢ়ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। ২. ব্রাইটনেস (brighiness) এবং কন্ট্রাস্ট (contrast) ঠিক করে দেখতে হবে।

ক্রমিক	সমস্যা	সাধারণ সমাধান
১৬.	প্রিন্টারে প্রিন্ট হচ্ছে না।	১. সঠিক মডেলের প্রিন্টার নির্বাচন করা হয়েছে কিনা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। ২. প্রিন্টারের সাথে পাওয়ার ক্যাবলটি সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। ৩. প্রিন্টার অন/চালু করা আছে কিনা দেখতে হবে। ৪. কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টারের ডেটা ক্যাবল সংযুক্ত আছে কিনা দেখতে হবে। ৫. প্রিন্টারের ভিতরে কোনো প্রকার কাগজ কিংবা অন্য কোনো কিছু আটকে আছে কিনা তা প্রিন্টার খুলে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ৬. প্রিন্টারের কার্টিজে কালি আছে কিনা তা দেখ অথবা প্রিন্টার থেকে কার্টিজটি খুলে ভালোভাবে নেড়ে পুনরায় কার্টিজটিকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দেখতে হবে। ৭. প্রিন্টার চালু করার সাথে সাথে যদি লাল কিংবা ব্লিংকিং হলুদ বাতি জ্বলতে থাকে তাহলে প্রিন্টারের রিসেট বাটনে চাপ দিতে হবে। ৮. যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে নতুন করে প্রিন্টারের সাথে সরবরাহকৃত ড্রাইভার সফ্‌টওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে। ৯. হার্ডওয়্যারে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে হবে।

দলগত কাজ

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ ছাড়াও কম্পিউটারে আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা আলোচনা করে সমাধানের উপায় চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

১. টেম্পোরারি ফাইল বেশি হলে কী ঘটে?

ক. কম্পিউটার স্লো হয়ে যায় খ. কম্পিউটারের গতি বেড়ে যায়

গ. এন্টিভাইরাস কাজ করে না ঘ. ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায় না

২. সিডি, ডিভিডি বা পেন ড্রাইভ থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে কোন প্রোগ্রামটি প্রথমে চালু হয়?

ক. Setup খ. Autorun

গ. Read me ঘ. Restart

৩. কোনটি আধুনিক পৃথিবীর সম্পদ?

ক. তথ্য খ. উপাত্ত

গ. কম্পিউটার ঘ. ইন্টারনেট

৪. সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে–

i. হার্ডওয়্যার সেটিকে সাপোর্ট করে কিনা

ii. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি বন্ধ করা হয়েছে কিনা

iii. এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি আছে কিনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইকরাম সাহেব দেখছেন কয়েকদিন ধরে তার কম্পিউটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আবার চালু হয়। আরও লক্ষ করলেন কম্পিউটারটির কাজের গতিও কমে গেছে। তার মনে পড়লো বন্ধুর পেনড্রাইভ থেকে একটি গান কপি করার পর থেকে এটা শুরু হয়েছে।

৫. কম্পিউটারের এ অবস্থার জন্য কোনটি দায়ী?

ক. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার খ. ভাইরাস সফটওয়্যার

গ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার ঘ. এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার

৬. এর ফলে ইকরাম সাহেবের কম্পিউটারে–

i. অপ্রত্যাশিত কোনো বার্তা প্রদর্শন করতে পারে

ii. রাখা ফাইলগুলোর আকার বেড়ে যেতে পারে

ii. মেমোরি কম দেখাতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. তোমার এক বন্ধু প্রায়ই কম্পিউটারে গেমস খেলে। এতে তার কী কী ক্ষতি হতে পারে? বর্ণনা কর।

৮. 'কম্পিউটারের সাধারণ ট্রাবলশ্যুটিং জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' - উক্তিটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি

এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- ডিজিটাল কন্টেন্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাঠ্যবিষয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;
- ক্যারিয়ার উন্নয়নে আইসিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারব।

ইন্টারনেট

আমরা ইতোমধ্যে শিখেছি যে ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি নেটওয়ার্ক যা সারা বিশ্বের কম্পিউটার এবং ডিভাইসসমূহকে সংযুক্ত করে। তার বা বেতার মাধ্যমে এটি মানুষ কিংবা ডিভাইসকে তথ্য শেয়ার করতে এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে, ইমেল পাঠাতে বা বন্ধুদের সাথে চ্যাট করতেও এটি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এতে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহৃত হয়।

ডিজিটাল কনটেন্ট

কোনো কনটেন্ট যদি ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ করে, প্রকাশিত হয় কিংবা প্রেরিত-গৃহীত হয় তাহলে সেটিই ডিজিটাল কনটেন্ট। তবে সেটি ডিজিটাল বা এনালগ যেকোনো পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হতে পারে। ডিজিটাল কনটেন্ট কম্পিউটারের ফাইল আকারে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্প্রচারিত হতে পারে। লিখিত তথ্য, ছবি, শব্দ কিংবা ভিডিও ডিজিটাল কনটেন্ট হতে পারে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের ফলে তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর সহজতর হয়।

ডিজিটাল কনটেন্ট-এর প্রকারভেদ

ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত যেকোনো তথ্য, ছবি, শব্দ কিংবা সবই ডিজিটাল কনটেন্ট। কাজেই নানাভাবে ডিজিটাল কনটেন্টকে শ্রেণিকরণ করা যায়। তবে, ডিজিটাল কনটেন্টকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট
- ছবি
- শব্দ বা অডিয়ো এবং
- ভিডিয়ো ও এনিমেশন।

টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট : ডিজিটাল মাধ্যমে এখনো লিখিত তথ্যের পরিমাণই বেশি। সব ধরনের লিখিত তথ্য এই ধারার কনটেন্ট। এর মধ্য রয়েছে নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, পণ্য বা সেবার তালিকা ও বর্ণনা, পণ্যের মূল্যায়ন, ই-বুক সংবাদপত্র, শ্বেতপত্র ইত্যাদি।

ছবি : সব ধরনের ছবি, ক্যামেরায় তোলা বা হাতে আঁকা বা কম্পিউটারে সৃষ্ট সকল ধরনের ছবি এই ধারার কনটেন্ট। এর মধ্যে রয়েছে ফটো, হাতে আঁকা ছবি, কার্টুন, ইনফো-গ্রাফিক্স, এনিমেটেড ছবি ইত্যাদি।

শব্দ বা অডিয়ো : শব্দ বা অডিও আকারের সকল কনটেন্ট এই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত। যেকোনো বিষয়ের অডিয়ো ফাইলই অডিয়ো কনটেন্ট-এর পাশাপাশি ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট অডিও কনটেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

ভিডিও ও এনিমেশন : বর্তমানে মোবাইল ফোনেও **ভিডিয়ো** ব্যবস্থা থাকায় **ভিডিয়ো** কনটেন্টের পরিমাণ বাড়ছে। ইউটিউব বা এই ধরনের ভিডিয়ো শেয়ারিং সাইটের কারণে ইন্টারনেটে ভিডিয়ো কনটেন্টের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ইন্টারনেটে কোনো ঘটনার ভিডিয়ো সরাসরি প্রচারিত হয়ে থাকে। এটিকে বলা হয় ভিডিয়ো স্ট্রিমিং। এমন কনটেন্টও ভিডিয়ো কনটেন্টের আওতাভুক্ত।

ই-বুক

ই-বুক বা ইলেক্ট্রনিক বুক বা ই-বই হলো মুদ্রিত বইয়ের ইলেক্ট্রনিক রূপ। যেহেতু, এটি ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে কারণে এতে শব্দ, অ্যানিমেশন ইত্যাদিও জুড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য এখন অনেক ই-বুক কেবল ই-বুক আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মুদ্রিত রূপ থাকে না। ফলে অনেকেই এখন আর ই-বুককে মুদ্রিত বইয়ের ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ বলতে নারাজ। এ ধরনের বই কেবল কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা বিশেষ ধরনের রিডার (ই-বুক রিডার) ব্যবহার করে পড়া যায়। প্রচলিত রিডারের মধ্যে অ্যামাজন ডটকমের (amazon.com) কিন্ডল (kindle) সবচেয়ে জনপ্রিয়।

ই-বুক ব্যবহারের সুবিধা

- ই-বুক ডাউনলোডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া সম্ভব।
- ব্যবহারিকভাবে ই-বুক সংরক্ষণের জন্য কোন লাইব্রেরি বা কক্ষের প্রয়োজন নেই, কম্পিউটার বা রিডিং ডিভাইসে ই-বুক সহজে সংরক্ষণ করা যায়।
- ই-বুক সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
- ই-বুকে তথ্য অনুসন্ধান সহজতর।
- ই-বুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বলে কোনো ধরনের শিপিং বা প্যাকিং খরচ নেই।
- ই-বুক সহজে বিতরণ ও বিক্রয়যোগ্য।
- ই-বুক মুদ্রণযোগ্য বলে চাহিদা অনুযায়ী প্রিন্ট করা সম্ভব, ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয়।

বিভিন্ন প্রকার ই-বুক

বর্তমানে ই-বুকের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ই-বুক রয়েছে। তবে, সাধারণভাবে ই-বুককে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি। এই ধরনের ই-বুকগুলো মূলত মুদ্রিত বইয়ের মতই হয়ে থাকে। সচরাচর এগুলো পিডিএফ (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট) ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বই একসঙ্গে অথবা অধ্যায় হিসেবে পাওয়া যায়।
- যে ই-বুকগুলো কেবল অনলাইনে তথা ইন্টারনেটে পড়া যায়, এগুলো সচরাচর এইচটিএমএল-এ প্রকাশিত হয়। এগুলোকে বই-এর ওয়েবসাইট বলা যায়।
- মুদ্রিত বই-এর মতো কিন্তু কিছুটা বাড়তি সুবিধাসহ ই-বুক। এগুলো বই-এর কনটেন্ট ছাড়াও পাঠকের নিজের নোট লেখা, শব্দের অর্থ জানা ইত্যাদি সুবিধা থাকে। এগুলোর বেশিরভাগই ই-পাব (EPUB) ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়। এসব ই-বুকের কোনো কোনোটি কেবল বিশেষ ডিভাইসে পড়া যায়। যেমন কিন্ডল বা আইবুক রিডারে পড়ার উপযোগী ই-বুক। তবে, আইবুকের ক্ষেত্রে নিজস্ব ফরম্যাট রয়েছে।
- চৌকস ই-বুক। এই বইগুলোতে লিখিত অংশ ছাড়াও অডিও/ভিডিও/এনিমেশন ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে। এই বইগুলোকে স্মার্ট ই-বুক বলা হয়। এগুলোর কনটেন্ট মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ। যেমন এতে কুইজ থাকে। কুইজের উত্তর করার ব্যবস্থাও থাকে এবং উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা তাও ই-বুক থেকেই জানা যায়। এমনকি এসব ই-বুকে ত্রিমাত্রিক ছবিও যুক্ত থাকে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে এর উৎপাদনকারী বা

নির্মাতারা এ সকল ই-বুক এমন ফরম্যাটে তৈরি করেন যা কেবল নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারে চলে। যেমন ওপেন কম্পিউটার্সের তৈরি আইবুক কেবল আইপ্যাড বা ম্যাক কম্পিউটারে ভালোভাবে পড়া যায়।

- ই-বুকের অ্যাপস। এক্ষেত্রে ই-বুকটি নিজেই একটি অ্যাপস আকারে প্রকাশিত হয়। অ্যাপস ডাউনলোড করে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে পড়া যায়। মুদ্রিত বই-এর মতো ই-বুকও কপিরাইটের আওতায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

শিক্ষায় ইন্টারনেট

আমরা ই-লার্নিংয়ের বিষয়টি পূর্বে আলোচনা করেছি। সেখানে জেনেছি রেডিয়ো, টেলিভিশন, সিডিরম, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট-ইত্যাদি নানা রকম মাধ্যম ব্যবহার করে কীভাবে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যাপারে ইন্টারনেটের ভূমিকা আলোচনা করব, যার অনেক কিছুই ইতোমধ্যে তোমাদের জানা হয়ে গেছে।

তোমরা সবাই এখন ইন্টারনেট শব্দটির সাথে পরিচিত, অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছ। এ প্রযুক্তিটি সারা পৃথিবীতে খুব বড়ো একটি পরিবর্তন এনেছে। এ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করার জন্যে আমাদের কিছু অবকাঠামো এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে প্রথমে একটি কম্পিউটার কিংবা স্মার্ট ডিভাইস দরকার। ইদানীং মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তিতে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং মানুষের ক্রয়সীমার ভেতরেই 'স্মার্টফোন' বলে বিবেচিত টেলিফোন চলে এসেছে। স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়। যেহেতু এগুলো টেলিফোন, তাই এর স্ক্রিন ছোটো তাই শিক্ষার জন্যে এটি ব্যবহার করা একটু কঠিন। তবে আশার কথা হচ্ছে যে, ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনের মাঝামাঝি একটি সম্ভাবনা রয়েছে যেটি ট্যাবলেট নামে পরিচিত এবং সেটি শিক্ষার কাজে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি অনেক কোম্পানি এই ট্যাবলেটকে মাথায় রেখে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব সেরকম অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে শুরু করেছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করার উপযোগী কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন হাতে চলে এলেই আমরা কিন্তু ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করতে পারি না। প্রয়োজন হয় ইন্টারনেট সংযোগের। দেশের সব জায়গায় সমানভাবে ইন্টারনেট সংযোগ নেই, তাই সবাই সমানভাবে ইন্টারনেটে স্পিড পায় না এবং ইন্টারনেটের স্পিড কম হলে সেটি ব্যবহার করা অনেক সময়েই অর্থহীন হয়ে যায়। আবার ভালো স্পিডের ইন্টারনেট পেতে হলে যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয় সেটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। কাজেই শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে আমাদেরকে এই ইন্টারনেট সংযোগটি অনেক সাশ্রয়ী খরচে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্ভব হলে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি এই দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীর ল্যাপটপ কিংবা ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ থাকে এবং দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইডথের (bandwidth) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকে তাহলেই কিন্তু পুরোটা শেষ হয়ে যাবে না। এরপরের প্রশ্ন ইন্টারনেটে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কী ব্যবহার করবে? তাদের উপযোগী contents কী রয়েছে? সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষায় সেগুলো এখনো সেভাবে নেই। সেগুলো সরকারি উদ্যোগে কিংবা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আমরা খুব দ্রুত সেগুলো ইন্টারনেটে পেতে শুরু করব বলে আশা করছি।

এ মুহূর্তে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী পড়ালেখা করতে করতে কোনো একটা বিষয় বুঝতে না পারলে সে যদি ইন্টারনেটে সেটি অনুসন্ধান করে– মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা

যায় সে তার উত্তরটি কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যাবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় শিখতে চায় কিংবা জানতে চায় সে ইন্টারনেটে তা খুঁজে বের করে নিতে পারবে– এজন্যে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের পাশাপাশি অত্যন্ত দক্ষ সার্চ ইঞ্জিনও আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদগণ তৈরি করেছেন। তবে এ সার্চ ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

গণিতের অত্যন্ত চমৎকার কিছু সাইট রয়েছে যেখানে গণিতের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাতে-কলমে দেখার জন্যেও সাইট রয়েছে। উৎসাহী মানুষেরা নানা বিষয়ে গ্রুপ তৈরি করে রেখেছেন, তাদের কাছে যেকোনো প্রশ্ন দেওয়া হলে তারা উত্তর দিতে পারেন। বাংলায় শিক্ষা দেয়ার জন্যেও ইন্টারনেটে অত্যন্ত চমৎকার কিছু সাইট রয়েছে।

ইন্টারনেটে শিক্ষার একটা বিশাল জগৎ বিভিন্ন দুর্যোগকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা প্রমাণিত ভবিষ্যতে শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারনেট ও আমার পাঠ্য বিষয়গুলো

একজন শিক্ষক আসলে একটা আলোক শিখার মতো। তিনি অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেন, সেই আলোতে চারদিক আলোকিত হয়। শিক্ষার্থীরা সেই আলোতে সব কিছু দেখতে পায় এবং নিজেদের যেটুকু প্রয়োজন কিংবা যেটুকু শিখতে চায় সেটুকু শিখে নেয়। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকও আসলে কাউকে কিছু শেখাতে পারেন না– তারা শুধু সাহায্য করেন, শিক্ষার্থীকে নিজেরই সব কিছু শিখতে হয়।

শিক্ষার সাথে ইন্টারনেট শব্দটি জুড়ে দিয়েও একটি ব্যাপার মনে করিয়ে দিতে হবে, কেউ যেন মনে না করে ভালো ইন্টারনেট সংযোগ কিংবা ইন্টারনেটে খুব ভালো content থাকলেই রাতারাতি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় খুব ভালো হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রছাত্রীদের এই সুযোগটা দিয়ে নতুন একটি জগৎ উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে মাত্র, সেই জগৎ থেকে কতটুকু গ্রহণ করবে সেটা পুরোপুরি একজন শিক্ষার্থীর ব্যাপার। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তোমাদের পরিচিত কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে শুধু কম্পিউটার গেম খেলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সাইটে সময় নষ্ট করছে। আবার সেই সুযোগ গ্রহণ করে অন্য কেউ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখছে।

তোমরা জানো ইন্টারনেটে তোমাদের সকল পাঠ্যবইগুলো পাওয়া যায়। বছরের শুরুতে তোমাদের হাতে পাঠ্যবইগুলো পৌঁছে যায়। কোনো কারণে সেই বই যদি কেউ হারিয়ে ফেল, কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তোমরা কিন্তু তখন ইচ্ছে করলে ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারবে। তোমরা শুনে খুশি হবে বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী মানুষেরা মিলে এই বইগুলোর সফট কপি তৈরি করে সেগুলোতে কণ্ঠ দিয়ে বইগুলো সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও এই বইগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে তোমাদের জন্যে সবগুলো বই প্রকাশ করা হয় এবং বিনামূল্যে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তার বাইরেও তোমাদের লেখাপড়ার কাজে লাগতে পারে এরকম অনেক বই লেখা হয়। (এখানে কিন্তু মোটেও গাইড বইয়ের কথা বলা হচ্ছে না- সেগুলো কখনোই কাউকে শিখতে সাহায্য

> কাজ
>
> তোমরা কীভাবে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে উপকৃত হতে পার? ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে এ বিষয়ে অনধিক ১০০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

করে না।) যারা সেই বই লেখেন তাদের অনেকেই এ বইগুলো তোমাদের ব্যবহারের জন্যে ইন্টারনেটে দিয়ে দেন। বাজার থেকে টাকা দিয়ে বই না কিনে যেকেউ এ বইগুলো ইন্টারনেট থেকে সরাসরি নামিয়ে নিতে পারে। পৃথিবীর অনেক লেখকই আজকাল তাদের বইগুলো ইন্টারনেটে সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে শুরু করেছেন। তোমরা একটু খোঁজ করলেই তোমার পছন্দের অনেক বই একেবারে বিনামূল্যে ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে। তবে তোমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন তুমি কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে কারো রাখা বই বেআইনিভাবে নামিয়ে না ফেলো।

আমরা সবাই জানি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যেটুকু থাকে সেটুকুতে ছাত্রছাত্রীরা সন্তুষ্ট থাকে না, তারা আরও বেশি জানতে চায়। সেজন্যে সব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শখের বিষয় বিজ্ঞান, গণিত কিংবা সাহিত্যের ক্লাব তৈরি করে। এক সময় এধরনের ক্লাবে শুধু শারীরিকভাবে উপস্থিত ছেলেমেয়েরাই অংশ নিতে পারত। ইন্টারনেট হওয়ার কারণে বিষয়টা এখন পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন সারা দেশের এমনকি সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা এই ক্লাবগুলোতে অংশ নিতে পারে। তারা সবাই মিলে পাঠজগতের বিষয়গুলোকে অন্য একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশেও এখন বিভিন্ন বিষয়ের অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হচ্ছে এবং তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছো।

ওয়েব পেইজ (Web page)

ওয়েব পেইজ অথবা সংক্ষেপে ওয়েব হলো এক ধরনের ডকুমেন্ট যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web-WWW) ও ইন্টারনেট ব্রাউজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। কাজেই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ফাইলকে ওয়েব পেইজ বলে। ওয়েব পেইজ সাধারণত এইচটিএমএল (Hyper Text Markup Language-HTML) দ্বারা তৈরি করা হয়। ওয়েব পেইজে টেক্সট বা লেখা, ছবি, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ডেটা ফাইল, ভিডিয়ো, অডিয়ো ইত্যাদি এবং অন্য কোনো পেইজের লিংক বা হাইপারলিংক থাকতে পারে। আর ওয়েব পেইজের বিষয়বস্তু ব্রাউজারে প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ফাইলের প্রয়োজন হয়।

ওয়েবসাইট ও ওয়েব পোর্টাল (Web site & Web Portal)

ইন্টারনেটের সাথে যথাযথভাবে সংযুক্ত কোনো কম্পিউটারের বরাদ্দকৃত স্পেস বা লোকেশন যাতে এক বা একাধিক ওয়েব পেইজ সংরক্ষণ করে রাখা যায় তা হলো ওয়েবসাইট। অন্যদিকে ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন লিংক, কনটেন্ট ও সার্ভিস বা সেবার সংগ্রহ যা ব্যবহারকারীদেরকে তথ্য জানানোর জন্য সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়। ওয়েবসাইটের যে কোনো একটি সার্ভিস ওয়েব পোর্টালের একটি অংশ হতে পারে। যেমন: কোনো এয়ার লাইন কোম্পানির ওয়েব পোর্টাল হতে ফ্লাইটের সময়সূচি জানা এবং টিকিট বুকিং এর ব্যবস্থা। ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলিতে পণ্যের বিজ্ঞাপন এবং পণ্য কেনাবেচা করার সার্ভিসও পোর্টাল এর একটি অংশ। একটি পোর্টাল পেইজে বাইরের সোর্স (উৎস) হতে তথ্য উপস্থাপনের ব্যবস্থা থাকে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' পোর্টালটির (www.bangladesh.gov.bd) কথা উল্লেখ করা যায় যেখান থেকে বাংলাদেশের সরকারি পর্যায়ের সকল ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

ওয়েব সাইট ও ওয়েব ক্লায়েন্ট (Web site and Web Client)

একটি ওয়েবসাইটের দুটি অংশ থাকে। যথা-ওয়েবসার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে সার্ভারের কাছে ডেটা পাঠায় যাকে বলা হয় রিকোয়েস্ট (request)। সার্ভার সেই ডেটা অনুসারে

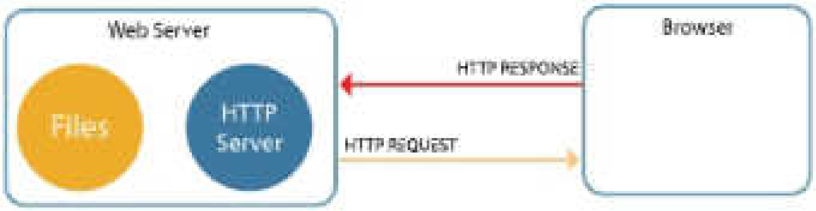

ক্লায়েন্টের কাছে জবাব বা রেসপন্স (response) পাঠায়। ওয়েব সার্ভার এক বিশেষ ধরনের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার যা এক সাথে অনেক ব্যবহারকারী বা ক্লায়েন্টকে সেবা প্রদান করতে পারে। যেমন-বাংলাদেশ সরকারের সকল ধরনের ফরম forms.gov.bd অ্যাড্রেসে পাওয়া যায়।

জনগণের সুবিধার্থে একটি ওয়েব এনাবেল্ড ডেটাবেজে বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ফরম সংরক্ষিত আছে যা ইন্টারনেটে যে কেউ ঐ ঠিকানা থেকে অ্যাকসেস করতে পারে।
সাধারণত ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজে থেকে ডেটা অ্যাক্সেস করে গ্রাহকের কম্পিউটারে প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের মিডলওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা পূর্বে থেকে রক্ষিত ডেটা ইন্টারনেটের বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারে। যেমন একজন ক্রেতা তার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের দাম জানার জন্য অনলাইনে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিক্রেতার ওয়েব এনাবেলড্ ডেটাবেজের মাধ্যমে তৈরি করা ওয়েবসাইটে মধ্যে সার্চ করতে পারে। এমনকি কোনো ক্রেতা তার বাসায় বসে থেকে ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিক্রেতার ওয়েবসাইটি অ্যাক্সেস করতে পারে।

ওয়েব ক্লায়েন্ট (Web Client) : ইন্টারনেট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে কোনো ব্যবহারকারী বা ক্লায়েন্ট সাধারণত HTTP (Hypertext Transfer Protocol) অথবা HTTPs (Hypertext Transfer Protocol Secure) প্রোটোকল ব্যবহার করে ওয়েব সার্ভারের কাছে কোনো উপাত্ত বা তথ্য চেয়ে অনুরোধ (request) পাঠায়। ক্লায়েন্টের অনুরোধগুলো সাধারণত ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে পাঠানো হয় এবং অনুরোধের ফলাফল ওয়েব সার্ভার থেকে প্রাপ্ত হয় যা সাধারণত ওয়েব ব্রাউজারেই প্রদর্শিত হয়। TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) প্রোটোকল এক ধরনের কমিউনিকেশন প্রোটোকল যা ইন্টারনেটে ব্যবহার করা হয়।

ডাউনলোড : কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডাউনলোড হচ্ছে একটি দূরবর্তী সিস্টেম থেকে স্থানীয় সিষ্টেমে তথ্য পাওয়ার উপায়। অর্থাৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট হতে কোনো তথ্য নিজস্ব কম্পিউটার বা ডিভাইসে সংরক্ষণ করা। যেমন: ই-মেইল বা ওয়েবসাইট হতে কোনো ফাইল নিজের ডিভাইসে সংরক্ষণ বা সেভ করা।

ডাউনলোড : কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ডাউনলোড হচ্ছে একটি দূরবর্তী সিস্টেম থেকে স্থানীয় সিস্টেমে তথ্য পাওয়ার উপায়। অর্থাৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট হতে কোনো তথ্য নিজস্ব কম্পিউটা বা ডিভাইসে সংরক্ষণ করা। যেমন: ই-মেইল বা ওয়েবসাইট হতে কোনো ফাইল নিজের ডিভাইসে সংরক্ষণ বা সেভ করা।

আপলোড : আপলোড হচ্ছে স্থানীয় সিস্টেম হতে নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো সিস্টেমে তথ্য পাঠানো। যেমন: ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো ফাইল কাউকে পাঠানো হলে তা ঐ ই-মেইল সার্ভারে সেভ হয়।

ওয়েব ব্রাউজার (Web Brwoser)

ইন্টারনেটকে তথ্যের মহাসমুদ্র বলা হয়, কারণ ইন্টারনেট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্কে সংযুক্ত সকল কম্পিউটরে যে সকল ইনফরমেশন রয়েছে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। যে সফটওয়্যার ইন্টারনেটের ইনফরমেশন বা Web page বা World Wide Web-WWW প্রদর্শনের কাজ করে তাকে ওয়েব ব্রাউজার বলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওয়েব সার্ভারে রাখা পরস্পরের সংযোগযোগ্য Web page বা WWW পরিদর্শন করাকে Web Brwosing বলে। Web Brwosing করে বিভিন্ন তথ্য ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে নিয়ে আসা যায়। Web Brwosing করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। এই সকল ওয়েব ব্রাউজার সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত ওয়েব সার্ভার কম্পিউটারগুলোতে যে সকল ওয়েব পেইজ (Web page) সংরক্ষিত রয়েছে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। ১৯৯০ সালে টিম বার্নাস লি WorldWideWeb নামে সর্বপ্রথম ওয়েব ব্রাউজার তৈরি করেন। উল্লেখ্য যে WorldWideWeb ই বিশ্বের প্রথম ওয়েব ব্রাউজার হিসেবে পরিচিত। নিচে বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় কিছু ওয়েব ব্রাউজারের নাম দেওয়া হলো। যথা-

- ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (Internet Explorer) অথবা মাইক্রোসফট এজ
- মজিলা ফায়ারফক্স (Mozilla Firefox)
- সাফারি (Safari)
- ওপেরা (Opera)
- গুগল ক্রোম (Google crome) ইত্যাদি।

Web Browsing সফটওয়্যারে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো-

URL : একটি ওয়েবসাইট বা পেজের পূর্ণাঙ্গ এড্রেসকে URL বলে। URL এর পূর্ণরূপ হলো Uniform Resources Locator। যেমন- http://www.shikkha.com ; তবে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র www. shikkha.com বা shikkha.com কে URL বলা হয় না। URL এর তিনটি অংশ থাকে। যথা-(১) প্রোটোকলের নাম, (২) হোস্টনেইম ও (৩) ফাইলের অবস্থানসহ নাম। যেমন-

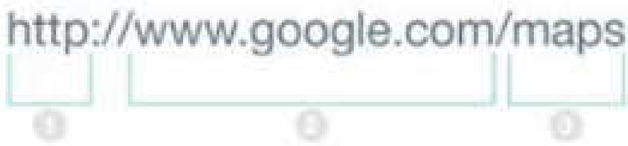

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে এক নামে একটিমাত্র Web site থাকে।

Home page : কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানির বা ব্যক্তির ওয়েবসাইটের মূল পেইজকে Home page বলে। এটি সাধারণত Start page এ সেট করা থাকে। ওয়েব সার্ভারে যে Web page টি Start page হিসাবে সেট করা হয় ঐ Web page টি ব্যবহারকারীর হোমপেইজ। অর্থাৎ ব্রাউজারে ওয়েব অ্যাড্রেস টাইপ করার সাথে সাথে যে পেইজটি প্রদর্শিত হয় তাই হলো হোম পেইজ।

Bookmark : Bookmark হচ্ছে একটি Web page লিস্ট। যেখান থেকে কোনো Web page এর নাম সিলেক্ট করে সরাসরি সেই Web page এ যাওয়া যায়।

Reload/Refresh : যেসকল Web page এর ডেটা অনবরত পরিবর্তন হয় সে সকল Web page পড়ার সময় মাঝ পথে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য Reload / Refresh কমান্ড দিতে হয়। বিশেষ করে ডাইনামিক ওয়েব পেজের জন্য Reload / Refresh কমান্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Stop : কোনো Web page এ ডেটা ডাউনলোড হওয়ার সময় যদি ঐ Web page না দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন Stop বাটনে ক্লিক করে ডাউনলোড বন্ধ করে দিতে হয়।

Search : ইন্টারনেটে কোনো কিছু খোঁজাকে Search বলে। খোঁজার কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য বেশ কিছু সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে। যেমন- Google, Bing, Yahoo ইত্যাদি।

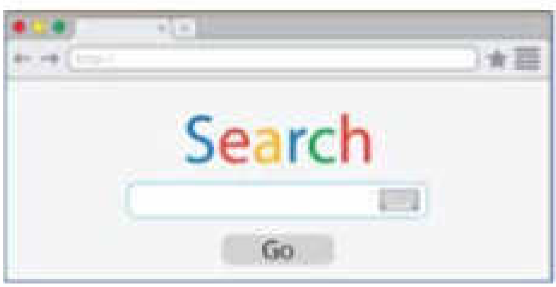

সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine) : সার্চ ইঞ্জিন একটি সফটওয়্যার টুল যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব থেকে ইনফরমেশন খুঁজে বের করে। যেমন- Google, Yahoo, Bing, MSN ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১. ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই কোনটির প্রয়োজন?

ক. ডেস্কটপ পিসি খ. ট্যাবলেট পিসি
গ. স্মার্টফোন ঘ. ইন্টারনেট সংযোগ

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি?

ক. কম্পিউটার খ. টেলিভিশন
গ. ইন্টারনেট ঘ. স্মার্টফোন

৩. ডিজিটাল কনটেন্ট হলো–

i. ই-বুক, ব্লগপোস্ট ও ই নিবন্ধ
ii. ইনফো গ্রাফিকস ও অ্যানিমেটেড ছবি
iii.অডিয়ো ও ভিডিয়ো স্ট্রিমিং

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের লেখাটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিনি ও রনির বাবা তাদের জন্য একটি ট্যাবলেট পিসি কিনে দিলেন। রিনি নবম শ্রেণিতে ও রনি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে।

৪. রিনি ও রনির ট্যাবলেট পিসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার হবে-

ক. গেমস খেলায় খ. গান শোনায়
গ. হিসাব নিকাশে ঘ. লেখাপড়ার কাজে

৫. রিনি ও রনির জন্য ট্যাবলেট পিসিটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে-

i. দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন
ii. কমখরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে
ii. ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়াতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. আইসিটি কীভাবে আমাদের ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

৭. 'বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছাড়া লেখাপড়া করা কঠিন'- যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

২০১৮

চতুর্থ অধ্যায়

আমার লেখালেখি ও হিসাব

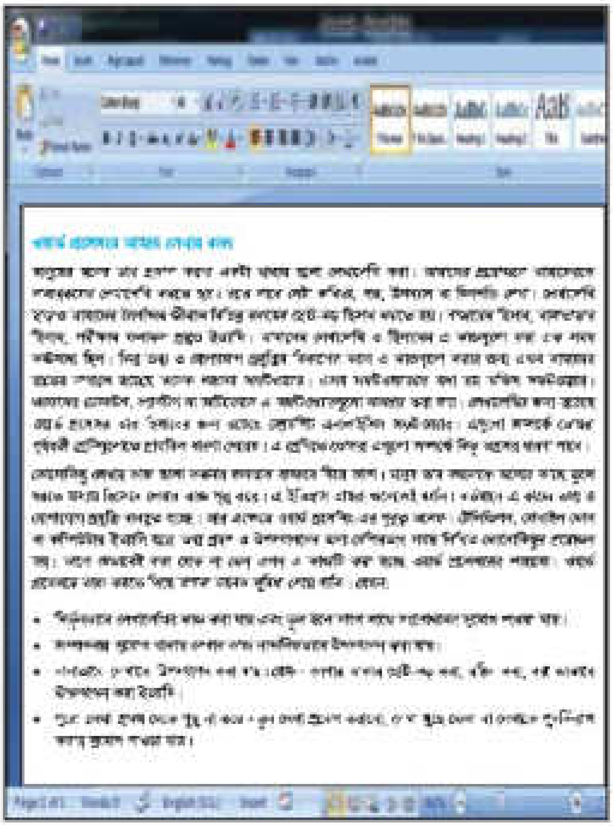

এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- ওয়ার্ড প্রসেসরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ওয়ার্ড প্রসেসরে ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- স্প্রেডশিটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্প্রেডশিটের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব;
- স্প্রেডশিটের ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- ওয়ার্ড প্রসেসরে ব্যবহার করে সম্পাদনা করতে পারব;
- স্প্রেডশিট ব্যবহার করে হিসাব-নিকাশ করতে পারব।

ওয়ার্ড প্রসেসরে আমার লেখার কাজ

মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার একটা মাধ্যম হলো লেখালেখি করা। আমাদের প্রয়োজনে আমাদেরকে নানারকমের লেখালেখি করতে হয়। হতে পারে সেটা কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা দিনপঞ্জি লেখা। লেখালেখি ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রকমের ছোটো-বড়ো হিসাব করতে হয়। বাজারের হিসাব, বাসাভাড়ার হিসাব, পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ইত্যাদি। আমাদের লেখালেখি ও হিসাবের এ কাজগুলো করা এক সময় কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে এ কাজগুলো করার জন্য এখন আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে অনেক ধরনের সফটওয়্যার। এসব সফটওয়্যারকে বলা হয় অফিস সফটওয়্যার। আমাদের ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে এ সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা যায়। লেখালেখির জন্য রয়েছে ওয়ার্ড প্রসেসর আর হিসাবের জন্য রয়েছে স্প্রেডশিট এনালাইসিস সফটওয়্যার। এগুলো সম্পর্কে তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছ। এ শ্রেণিতে তোমরা এগুলো সম্পর্কে কিছু অগ্রসর ধারণা পাবে।

কোনোকিছু লেখার কাজ হলো কল্পনার জগৎকে বাস্তবে নিয়ে আসা। মানুষ তার কল্পনাকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে মাধ্যম হিসেবে লেখার কাজ শুরু করে। এ ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি। বর্তমানে এ কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর গুরুত্ব অনেক। টেলিভিশন, মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রে তথ্য গ্রহণ ও উপস্থাপনের জন্য বেশিরভাগ সময় লিখিত কোনোকিছুর প্রয়োজন হয়। আগে যেভাবেই করা হোক না কেন এখন এ কাজটি করা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসরের সাহায্যে। ওয়ার্ড প্রসেসরে কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সুবিধা পেয়ে থাকি। যেমন:

- নির্ভুলভাবে লেখালেখির কাজ করা যায় এবং ভুল হলে সাথে সাথে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।
- সম্পাদনার সুযোগ থাকায় লেখার কাজ নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- নানাভাবে লেখাকে উপস্থাপন করা যায়। যেমন- লেখার আকার ছোটো-বড়ো করা, রঙিন করা, বক্স আকারে উপস্থাপন করা ইত্যাদি।
- পুরো লেখা প্রথম থেকে শুরু না করে নতুন লেখা প্রবেশ করানো, লেখা মুছে ফেলা বা লেখাকে পুনর্বিন্যাস করার সুযোগ পাওয়া যায়।
- ছবি, গ্রাফ, টেবিল, চার্ট ইত্যাদি সংযোজন করে ডকুমেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়।
- ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে তা যেকোনো সময় ব্যবহার করা যায়। ফলে একই কাজ বারবার করার প্রয়োজন হয় না।
- প্রয়োজনবোধে দরকারি তথ্য এক ডকুমেন্ট হতে অন্য ডকুমেন্টে কপি করা যায়।
- একই সাথে একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করা যায়।
- ফাইন্ড-রিপ্লেস কমান্ড ব্যবহার করে বড়ো কোনো ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজা যায় এবং প্রতিস্থাপন করা যায়।
- যখন কোনো ডকুমেন্ট বারবার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন সেটিকে টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করে রাখা যায় যাতে সময় সাশ্রয় হয়। যেমন- প্রতি সপ্তাহে ল্যাব রিপোর্ট প্রস্তুত করার প্রয়োজন হলে সেটি টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করে রাখলে তা বারবার ব্যবহার করা যায়।
- বড়ো আকারের ডকুমেন্টে যেমন গবেষণাপত্রে বিষয়বস্তুর সারণি, রেফারেন্স, ছবির তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি অনেক কাজ খুবই স্বল্প সময়ে সম্পাদন করা যায়।

- বানান দেখার সফটওয়্যার বা স্পেল চেকার-এর সাহায্যে সহজেই বানান সংশোধন করা যায়; স্বয়ংক্রিয়ভাবে বানান সংশোধনের ব্যবস্থাও ওয়ার্ড প্রসেসরে রয়েছে।
- ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে তা যেকোনো সময়, যতবার ইচ্ছা ততবার প্রিন্ট করার সুবিধা রয়েছে।
- ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় ডকুমেন্ট প্রেরণ করা যায়।
- কাগজের নথি বা ফাইলের পরিবর্তে ওয়ার্ড প্রসেসরে তৈরি ফাইল খুব সহজেই সংরক্ষণ করা যায়।
- ফাইলের ব্যবস্থাপনা সহজ যা আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনায় অপরিহার্য ইত্যাদি।

এছাড়াও ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারগুলোতে আরও নানা সুবিধা রয়েছে। আমরা এগুলো ব্যবহার করার সময় অনেক কিছু জানতে পারব। এতসব সুবিধার কারণে প্রতিদিন এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে।

তোমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে ওয়ার্ড প্রসেসরে নতুন ডকুমেন্ট সৃষ্টি এবং পুরানো ডকুমেন্ট খোলার কৌশল শিখেছ। আরও শিখেছ কীভাবে এ সকল ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করতে হয়। এবার আমরা ওয়ার্ড প্রসেসরের আরও কিছু কৌশল শিখব। কিন্তু এজন্য তোমাদের পূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে।

আমরা জানি মাইক্রোসফট অফিস হলো পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অফিস সফটওয়্যার রয়েছে। যার যেকোনো একটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। বর্তমানে অনেকেই এগুলোর সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহার করছে। তবে যেকোনো একটি সংস্করণে অভিজ্ঞ হলে অন্যটি ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা হয় না। বাংলাদেশে যেহেতু মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যারটি বেশি ব্যবহৃত হয় তাই এখানে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ এর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং মাইক্রোসফট এক্সেল এর ভিত্তিতে আলোচনা করব।

অফিস বাটন এবং এর অপশনসমূহ

ওয়ার্ড ২০০৭ চালু করার পরে একটি উইন্ডো খুলবে। এ উইন্ডোর উপরের বাম দিকের কোনায় আইকনটি হলো অফিস বাটন। এ বাটনটি ক্লিক করলে যে অপশনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো চিত্রে দেখানো হলো।

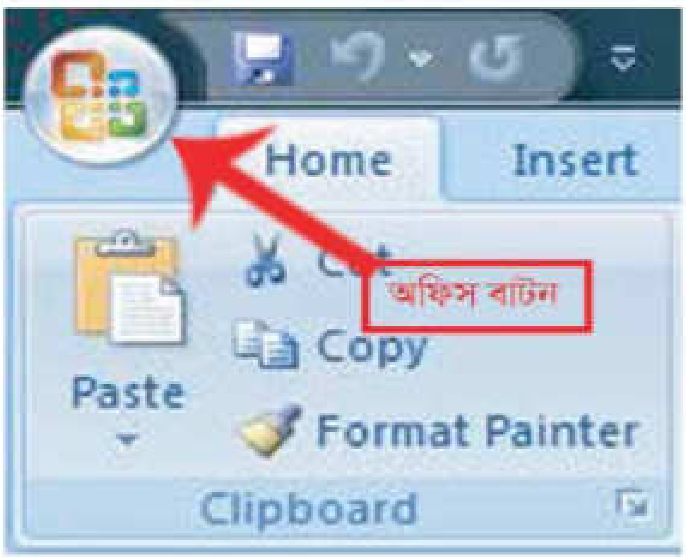

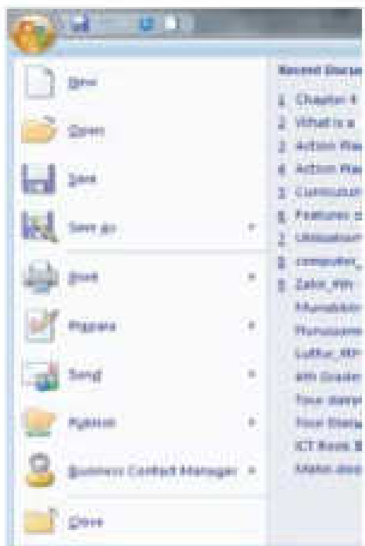

এ অপশনগুলোর মধ্যে বেশি প্রয়োজনীয়গুলো হলো–

নিউ: নতুন ডকুমেন্ট খুলতে এটা ক্লিক করতে হয়।

ওপেন: পূর্বে সংরক্ষণ করা কোনো ডকুমেন্ট খুলতে এটা ক্লিক করতে হয়।

সেইভ: ডকুমেন্টকে সংরক্ষণ করতে এখানে ক্লিক করতে হয়।

সেইভ এজ: একই ডকুমেন্টকে ভিন্ন নামে সংরক্ষণ করতে এখানে ক্লিক করতে হয়। এর মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্টকে অপরিবর্তিত রেখে নতুন নামে সংরক্ষণ করে তার ওপর কাজ করা যায়।

ক্লোজ: খোলা ডকুমেন্ট বন্ধ করার জন্য এখানে ক্লিক করতে হয়।

লেখালেখির সাজসজ্জা : ফন্ট স্টাইল নির্বাচন এবং এর সাইজ ও রং নির্ধারণ

তোমরা ইতোমধ্যে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে লেখালেখি করতে শিখে গেছো। এ লেখাগুলোকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় এ কাজটিকে "ফরমেটিং টেক্সট" বলা হয়।

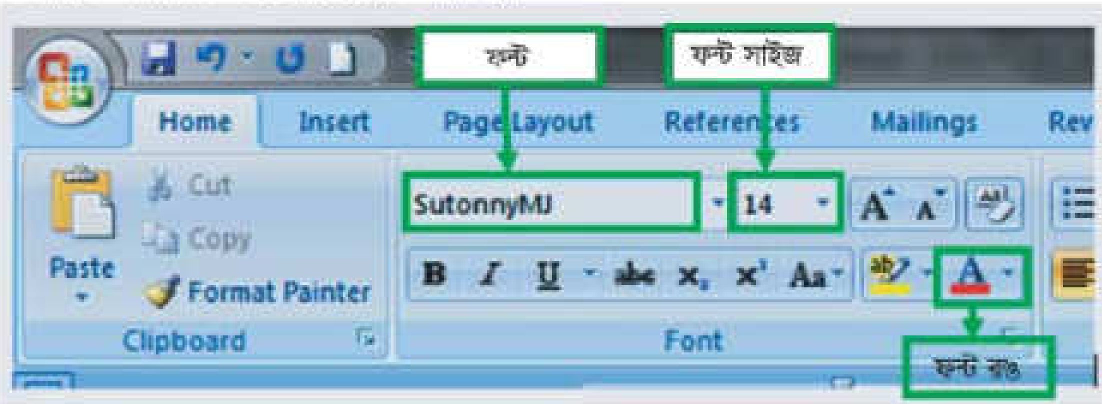

ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখালেখি করার জন্য বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষর রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ফন্ট। লেখালেখির সাজসজ্জায় প্রথমেই দেখতে হয় লেখাটি কোন ধরনের ফন্টে হবে। ফন্ট নির্বাচনের কাজটি করতে হয় হোম মেনুর ফন্ট গ্রুপের ফন্টের নামের ড্রপ-ডাউন বক্স থেকে। এখানে অসংখ্য ফন্টের মধ্য থেকে তোমার পছন্দমতো একটা ফন্ট বেছে নাও। অনেক সময় লেখার মাঝখানে ভিন্ন স্টাইলের ও সাইজের ফন্ট ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লেখাটিকে নির্বাচন করে ফন্ট গ্রুপের ফন্ট নামের ড্রপ-ডাউন বক্স থেকে ফন্ট নির্বাচন করে দিলে লেখাটি ঐ ফন্টে হবে। ফন্ট সাইজ নির্ধারণ করার জন্য ফন্ট নামের পাশে লেখা স খ্যার ড্রপ-ডাউন বক্সে ক্লিক করে ঈপ্সিত সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে। তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমতো ফন্টের রং নির্ধারণ করতে পার। এজন্য ফন্ট গ্রুপের আইকনের ড্রপ-ডাউন বক্সে ক্লিক করে ফন্টের রঙ নির্বাচন করতে হবে।

হোম ট্যাবের ফন্ট গ্রুপে ফন্ট বিষয়ক আরও অনেক সুবিধা আছে। তোমরা সেগুলো ব্যবহার করে দেখতে পারো।

কাজ

তোমার যেকোনো একটি পাঠ্যবই থেকে একটি প্যারাগ্রাফ ওয়ার্ড প্রসেসরে লিখে বিভিন্ন ফন্ট স্টাইল, সাইজ ও রঙের ব্যবহার কর এবং ডকুমেন্টটি একটি নাম দিয়ে সংরক্ষণ কর।

লেখালেখির সাজসজ্জা

বুলেট, নম্বর এবং লাইনের ব্যবধান

আমাদের ফল

- আম
- জাম
- লিচু
- কাঁঠাল
- নারকেল

আমাদের নদী

১. পদ্মা
২. মেঘনা
৩. যমুনা
৪. সুরমা
৫. ভৈরব
৬. তিস্তা

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকমের তালিকা করে থাকি। এসব তালিকায় ধারাবাহিকতা রাখার জন্য কোনো চিহ্ন, বর্ণ বা সংখ্যা ব্যবহার করে থাকি। এগুলোকে ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় বুলেট ও নম্বর বলা হয়।

হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায়।

লাইনের ব্যবধান: দুটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ধারণ করার জন্য টুলটি ব্যবহৃত হয়।

> **কাজ**
>
> বুলেট ও নম্বর ব্যবহার করে তোমার পছন্দের কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নাম লিখ।

লেখালেখির সাজসজ্জা: টেবিল ও বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন

ডকুমেন্টে কোনো টেবিল, ছবি, ক্লিপ আর্ট, বিভিন্ন আকার-আকৃতি, চার্ট টেক্সট বক্স, ওয়ার্ড আর্ট যোগ করতে রিবনের ইনসার্ট ট্যাব ব্যবহার করতে হয়।

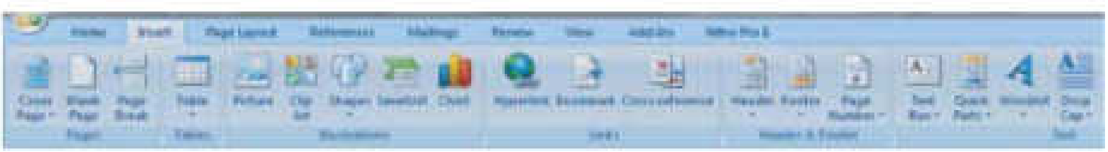

টেবিল বা সারণি যোগ করা

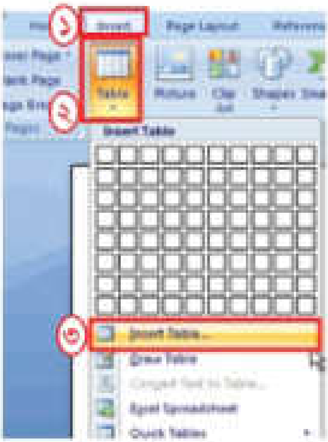

টেবিল বা সারণি যোগ করার জন্য ওয়ার্ড ২০০৭ এর রিবনের (১) ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করে (২) টেবিলে ক্লিক করতে হবে। তারপরে (৩) ইনসার্ট টেবিল ক্লিক করতে হবে। এরপর একটা ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখানে কলাম ও রো (সারি) সংখ্যা ঠিক করতে হবে।

কাজ

১০ জনের দলে ভাগ হয়ে সকলের নাম, পিতার নাম, বয়স, রোল নম্বর টেবিলে বা সারণিতে উপস্থাপন কর।

ছবি যোগ করা

ডকুমেন্টে ছবি যোগ করে ডকুমেন্টকে অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন এ বইয়ে তোমরা লেখার পাশাপাশি অনেক ছবি দেখতে পাচ্ছো। এগুলো যোগ করার জন্যও তোমাদের ওয়ার্ড ২০০৭-এর রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। তারপরে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে পিকচার আইকনে ক্লিক করতে হবে। এরপর একটা ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখানে তোমরা তোমাদের ছবির জায়গা নির্ধারণ করে ছবি নির্দিষ্ট করে দিলে ডকুমেন্টে ছবি যুক্ত হয়ে যাবে। এছাড়া ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে ক্লিপআর্ট, শেইপ (আকৃতি), স্মার্ট আর্ট, চার্ট যোগ করার সুবিধা রয়েছে।

কাজ

শিক্ষকের সহায়তায় তোমার তৈরি করা একটি ডকুমেন্টে ছবি যোগ কর।

ওয়ার্ড আর্ট যোগ করা

ইনসার্ট ট্যাব থেকে তোমরা ইচ্ছে করলে বিভিন্ন স্টাইলের লেখা যোগ করতে পার। এজন্য তোমাদের ইনসার্ট ট্যাবের টেক্সট গ্রুপে ওয়ার্ড আর্ট-এ ক্লিক করে তোমাদের পছন্দমতো স্টাইল নির্বাচন করতে হবে। তারপর যে ডায়ালগ বক্স আসবে তাতে ফন্ট ঠিক করে লেখা দিলে তা কাঙ্ক্ষিত স্টাইলে প্রদর্শন করবে।

মার্জিন ঠিক করা

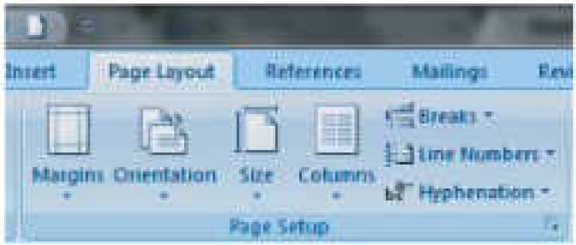

ডকুমেন্টের লেখার মার্জিন ঠিক করতে হলে রিবনের পেইজ লেআউট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। তারপরে মার্জিন আইকনে ক্লিক করে মার্জিন ঠিক করে দিতে হবে। মার্জিন আইকনে ক্লিক করলে মার্জিন নির্ধারণের বিভিন্ন অপশন দেখাবে। সেখান থেকে তোমাদের পছন্দমতো মার্জিন নির্ধারণ করে দিতে পার অথবা কাস্টম মার্জিনে ক্লিক করে তোমরা নিজস্ব মার্জিন ব্যবহার করতে পারো।

> কাজ ১
>
> তোমার বিদ্যালয়ের নাম ওয়ার্ড আর্টের বিভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন কর।
>
> কাজ ২
>
> একটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে মার্জিন নির্ধারণ কর।

প্যারাগ্রাফের লাইন ব্যবধান নির্ধারণ করা

ডকুমেন্টের প্রত্যেকটি লাইনের মধ্যে কী পরিমাণ ব্যবধান হবে তা নির্ধারণ করতে রিবনের পেইজ লেআউট ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। এখানে প্যারাগ্রাফ গ্রুপে স্পেসিং-এ লাইনের আগে ও পরে কত পয়েন্ট জায়গা থাকবে তা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ডকুমেন্ট টাইপ করার পরেও এ কাজটি করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রথমে ডকুমেন্টের যে অংশের লাইন ব্যবধান ঠিক করতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর উপরের বর্ণনা অনুযায়ী লাইন ব্যবধান ঠিক করে দিতে হবে।

> কাজ
>
> তোমার বাংলা অথবা ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি অংশ টাইপ করে তার লাইন ব্যবধান নির্ধারণ কর।

পৃষ্ঠার নম্বর দেওয়া

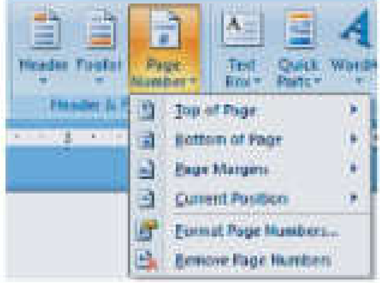

ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় নম্বর দেওয়া। এ কাজটি করার জন্য রিবনের ইনসার্ট ট্যাবে হেডার ও ফুটার গ্রুপে পেইজ নাম্বার ক্লিক করে নির্দিষ্ট অপশন বেছে নিতে হবে। তোমরা তোমাদের পছন্দমতো পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে পৃষ্ঠার নম্বর যোগ করতে পার।

> কাজ
>
> তোমার তৈরিকৃত একটি ডকুমেন্টে পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে সংরক্ষণ কর।

২০২১

বানান পরীক্ষণ ও সংশোধন

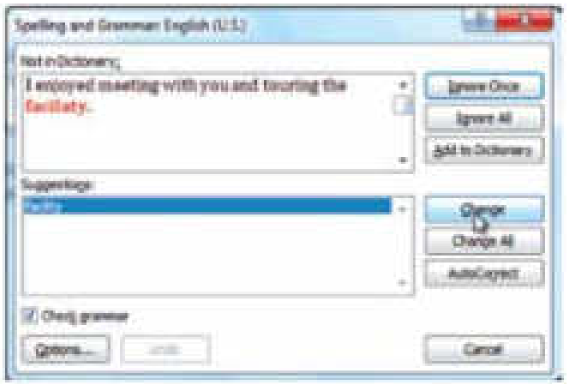

স্পেল চেকিং ডায়লগ বক্স

ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারের একটি বড়ো সুবিধা হচ্ছে বানান পরীক্ষণ। ডকুমেন্টের কোথাও কোনো বানান ভুল হলে তা পরীক্ষণ এবং সংশোধন করা যায়। ব্যাকরণও শুদ্ধ করা যায় অনেক ক্ষেত্রে। বানান পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন শব্দ প্রোগ্রামের অভিধানে সংযোজন করা যায়। বানান পরীক্ষণের সময় ভুল শব্দ বের করে সম্ভাব্য কিছু শুদ্ধ শব্দ উপস্থাপন করে, যাতে ব্যবহারকারী সঠিক শব্দটি বেছে নিতে পারে। এসময় অভিধানের ডিফল্ট ভাষা নির্ধারণ করে নিতে হয়। তা'না হলে আপাত শুদ্ধ বানান ভুল দেখাতে পারে। যেমন, যদি কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরের অভিধানে আমেরিকান ইংরেজি ভাষা নির্বাচন করা থাকে এবং ডকুমেন্ট colour শব্দটি লেখা হয়, তবে তা ভুল বানান হিসাবে সনাক্ত হবে। কারণ, colour বানানটি ব্রিটিশ ইংরেজির, আমেরিকান ইংরেজি অনুসারে এটি হবে color।

এছাড়া বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যক্তি বিশেষ, সংগঠন বা জায়গার নাম ইত্যাদিকে স্পেলচেকার ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে। এসব শব্দ ভুল না শুদ্ধ তা ব্যবহারকারীকেই নিশ্চিত করতে হয়।

স্প্রেডশিট ও আমার হিসাব-নিকাশ

স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ

চলো দেখি স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যগুলো:

স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- বিভিন্ন রকমের সংখ্যা বা অক্ষরভিত্তিক উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যায়।
- যেকোনো ধরনের হিসাবের জন্য সুবিধাজনক।
- কলাম ও সারি থাকার কারণে উপাত্ত শ্রেণিকরণ সহজ।
- সূত্র ব্যবহারের সুযোগ থাকায় অনেক বেশি উপাত্ত নিয়ে কাজ করা যায়।
- বিভিন্ন ফাংশন সূত্রাকারে ব্যবহার করে সহজে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যায়।
- আকর্ষণীয় গ্রাফ, চার্ট ব্যবহার করে উপাত্ত উপস্থাপন করা যায় ইত্যাদি।

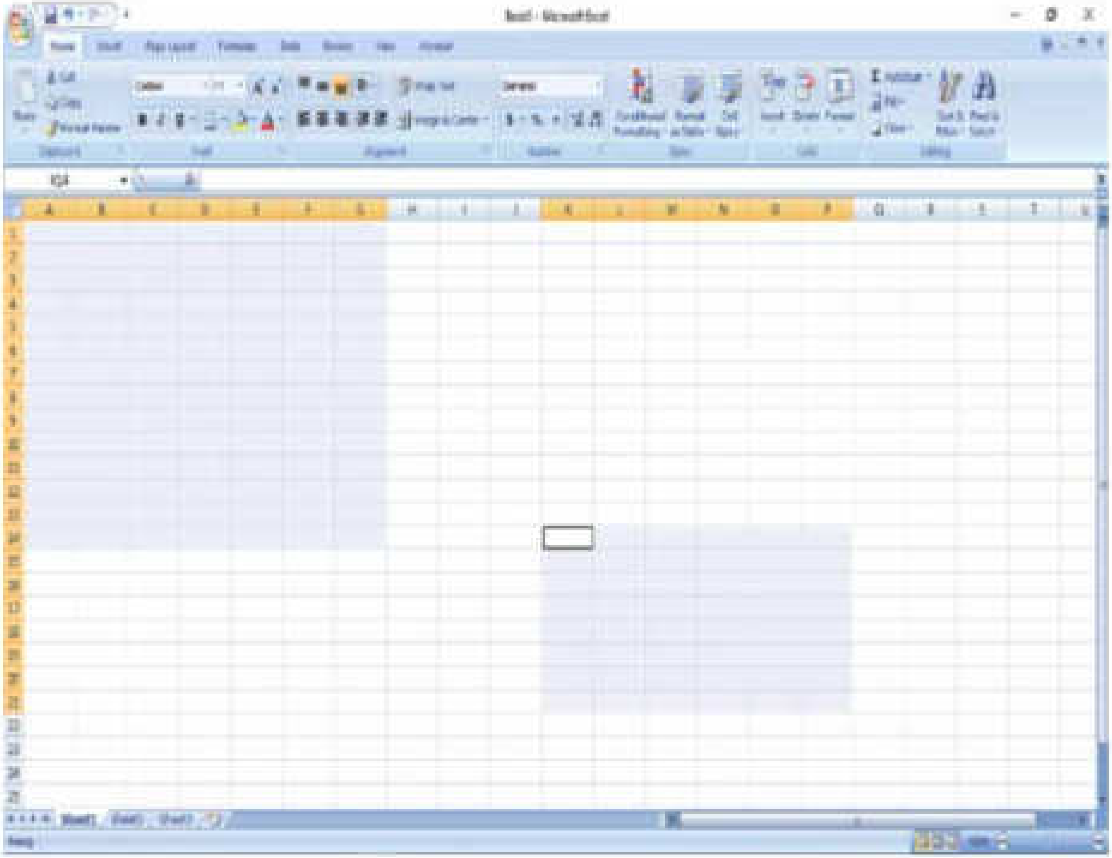

স্প্রেডশিট ব্যবহারের ক্ষেত্র

স্প্রেডশিট হচ্ছে এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা তালিকাবদ্ধভাবে ডেটা বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে স্প্রেডশিটের কতিপয় ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষাক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণ,
- আয়-ব্যয় হিসাবে;
- বাজেট তৈরিতে;
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত হিসাবে;
- এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশনে;
- আয়কর হিসাব ও বিশ্লেষণে;
- নির্বাচনের ভোট গণনায়;
- খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশল মূল্যায়নে।

স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল

তোমরা ইতোমধ্যে স্প্রেডশিট ব্যবহারের কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে শিখেছ। এ বইয়ে তোমরা আরও কিছু অগ্রসর ধারণা শিখতে পারবে।

গুণ করা

স্প্রেডশিটে গুণ করার জন্য ফলাফল সেলের মধ্যে সূত্র দিতে হয়। সূত্র সব সময় "=" সমান চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়। গুণ করার প্রক্রিয়া দু'ধরনের।

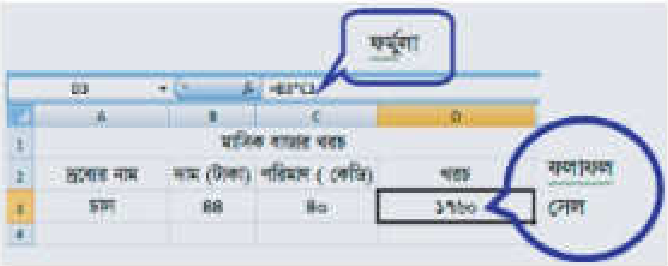

১. সাধারণভাবে সেলে সূত্র লিখে এন্টার দিলে ফলাফল পাওয়া যায়।

২. ফলাফল সেলে স্প্রেডশিট ফাংশন = PRODUCT লিখে সেলের রেঞ্জ দিয়ে এন্টার দিলে।

D3 | f_x =PRODUCT(B3:C3)

	A	B	C	D
1		মাসিক বাজার খরচ		
2	দ্রব্যের নাম	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	খরচ
3	চাল	৪৪	৪০	১৭৬০
4				

ফাংশন ব্যবহার করে গুণ করার সুবিধা হলো এখানে প্রয়োজন হলে অনেক বেশি সংখ্যক সেলের গুণফল রেঞ্জ দিয়ে সম্পন্ন করা যায়। নিচের চিত্রে তিনটি সেলের গুণ করার প্রক্রিয়া দেখানো হলো:

D3 | f_x =PRODUCT(A3:C3)

	A	B	C	D
1		ঘনকের আয়তন		
2	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	আয়তন
3	৪০	১৫	১৪	৮৪০০
4				

কাজ

একটি স্প্রেডশিট ফাইল খুলে কাল্পনিক কিছু তথ্যের গুণ কর।

ভাগ করা

স্প্রেডশিটে ভাগ করার কাজটিও সূত্র দিয়ে করতে হয়। ভাগ করার ক্ষেত্রে A1 সেলকে B1 সেল দিয়ে ভাগ করার জন্য ফলাফল সেলে = A1/ B1 সূত্র লিখতে হয়। এক্ষেত্রে / চিহ্নটি ভাগ চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

C3 fx =A3/B3

	A	B	C
1	এপ্রিল' ২০১৪		
2	মাসিক আয়	দিন সংখ্যা	দৈনিক আয়
3	৩৬০০০	১৫	=A3/B3

কাজ
সূত্রটি ব্যবহার করে তোমরা ফলাফল বের করার চেষ্টা করে দেখ।

শতকরা নির্ণয় করা

৪০০ টাকার ১৫% কত টাকা? ক্রয়মূল্য ১২০০ টাকা হলে ১৬% লাভে বিক্রয়মূল্য কত? বাস্তব জীবনে আমরা এ ধরনের অনেক হিসাবের মুখোমুখি হই। স্প্রেডশিটের মাধ্যমে সহজেই আমরা এ হিসাবগুলো করতে পারি।

C3 fx =A3*B3%

	A	B	C
1	কর নির্ধারণ		
2	আয়	করের হার	করের পরিমাণ
3	৪০০	১৫	৬০
4			

স্প্রেডশিটের মাধ্যমে প্রথম সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে ফলাফল সেলে =A3*B3% সূত্র প্রয়োগ করে সমাধান করা যায়। সূত্রটি কীবোর্ড ব্যবহার করে ফলাফল সেলে লিখার নিয়ম হলো প্রথমে = চিহ্ন দিয়ে ৪০০ লিখা সেলে ক্লিক করতে হবে। তারপর কীবোর্ডে * চাপতে হবে। তারপর ১৫ লিখা সেলে ক্লিক করতে হবে। এরপর কীবোর্ড থেকে % (শিফট কী চেপে ৫) লিখে এন্টার করতে হবে। পেয়ে যাবে তোমাদের ফলাফল।

দ্বিতীয় সমস্যাটি সমাধান করার জন্য =A3*B3%+A3 সূত্র ব্যবহার করতে হবে। এ সূত্রটি লিখার নিয়মও উপরের নিয়মের মতো।

কাজ
শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শতকরা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কর।
যেমন মি. চৌধুরীর মাসিক মূল বেতন ১৬৫০০ টাকা। তিনি ৫৫% হারে বাড়িভাড়া ভাতা এবং ৭০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। তাঁর মোট বেতন হতে ৯০ টাকা কল্যাণ তহবিল এবং যৌথবিমা বাবদ চাঁদা প্রদান করেন। তাঁর নিট বেতন কত?

*সফটওয়্যারের সংস্করণ ভিন্নতার কারণে টাইটেল ও মেনু বারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

অনুশীলনী

১. কোনো ডকুমেন্ট টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করা হয় কেন?

ক. নান্দনিকতার জন্য
খ. বারবার ব্যবহারের জন্য
গ. পুনর্বিন্যাস করার জন্য
ঘ. কপি সুবিধার জন্য

২. কোনো ডকুমেন্ট প্রথমবার সংরক্ষণ করতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. নিউ
খ. ওপেন
গ. সেইভ
ঘ. সেইভ এজ

৩. স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ ব্যবহার করে –

i. লেখালেখি করা সহজ
ii. সূত্র ব্যবহার করা যায়
iii. উপাত্ত বিন্যাস করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সৌমিত্র শখের বশে প্রকৃতি নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করেন। মাঝে মাঝে তার লেখার সাথে ফুল, পাখি বা নদীর ছবি দিতে হয়। তিনি পেশাগত জীবনে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। সেখানে তাকে কর্মচারীদের বেতনের হিসাব রাখতে হয় এবং মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়।

৪. সৌমিত্রকে তার শখের কাজে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়?

ক. ওয়ার্ড প্রসেসর
খ. স্প্রেডশিট
গ. গ্রাফিক্স
ঘ. ডেটাবেজ

৫. সৌমিত্রকে তার পেশাগত কাজে –

i. টেমপ্লেট ব্যবহার করতে হয়
ii. সূত্র ব্যবহার করতে হয়
iii. উপাত্ত বিন্যাস করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬. তালিকা তৈরি করতে ওয়ার্ড প্রসেসরে কোন ধরনের সাজসজ্জা (ফরমেটিং) ব্যবহার করা হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. স্প্রেডশিট বিশ্লেষণের ৫টি সুবিধা লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

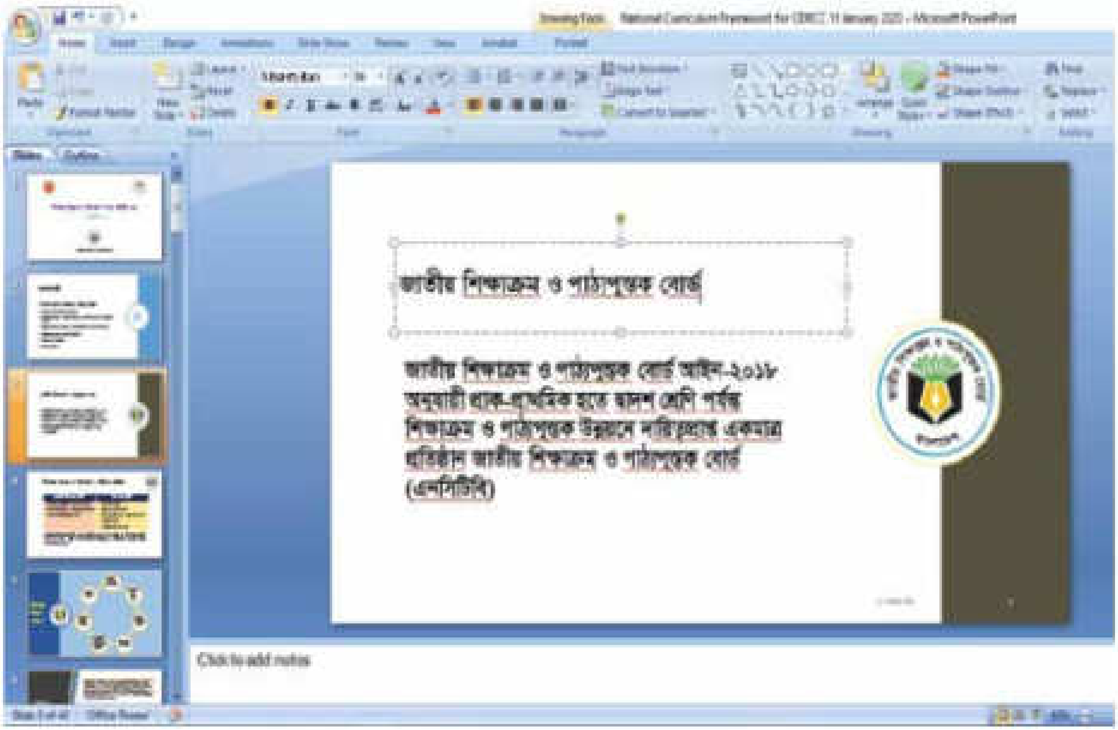

এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- ➢ মাল্টিমিডিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➢ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- ➢ মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- ➢ প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➢ প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ➢ প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- ➢ গ্রাফিক্স-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ➢ গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- ➢ প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিষয় সংশ্লিষ্ট Slide তৈরি ও উপস্থাপন করতে পারব;
- ➢ গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে সৃজনশীল চিত্র অঙ্কন ও উপস্থাপন করতে পারব।

মাল্টিমিডিয়ার ধারণা

আদিকাল থেকেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করেছে। লেখা একটি প্রকাশ মাধ্যম, শব্দ একটি প্রকাশ মাধ্যম আবার চিত্রও একটি প্রকাশ মাধ্যম। আমরা যখন অনেকগুলো প্রকাশ মাধ্যমকে নিয়ে কথা বলি তখনই মাল্টিমিডিয়া বলে তাকে চিহ্নিত করে থাকি। সভ্যতার বিবর্তন ও প্রযুক্তির কারণে এই মাধ্যমগুলোর বহুবিধ ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশেষ করে আমরা যখন ডিজিটাল যুগে বাস করছি তখন আমাদের প্রকাশ মাধ্যমের ধরন বদলে গেছে।

আমরা এখন অনুভব করি যে, এনালগ যুগের মিডিয়াগুলোই ডিজিটাল যুগের প্রধান প্রকাশ মাধ্যম নয়। বরং এনালগ যুগের পুরানো মিডিয়া এ যুগে ব্যবহৃত হলেও এর ব্যবহারের মাত্রা বদলেছে। এক সময়ে যেসব মিডিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতো তা এখন একসাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার সেই সব মিডিয়ায় যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল যন্ত্রের প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। আমরা এখন বহু মিডিয়াকে তার বহুমাত্রিকতা ও প্রোগ্রামিং ক্ষমতার জন্য বলছি ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া। এই দুটি শব্দ এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এক কথায় মাল্টিমিডিয়া মানে বহু মাধ্যম। ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া মানে হচ্ছে, সেই বহু মাধ্যম যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারে।

মাল্টিমিডিয়া হলো মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়। আমরা অন্তত তিনটি মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদেরকে প্রকাশ করি সেগুলো হলো বর্ণ, চিত্র এবং শব্দ (সাউন্ড)। এই মাধ্যমগুলোর বিভিন্ন রূপও রয়েছে। এই তিনটি মাধ্যম তাদের বিভিন্ন রূপ নিয়ে কখনো আলাদাভাবে, কখনো একসাথে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। এসব মাধ্যমের প্রকাশকে আমরা কাগজের প্রকাশনা,রেডিয়ো, টেলিভিশন,ভিডিয়ো, সিনেমা, ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েবপেজ ইত্যাদি নানা নামে চিনি। তবে এর সবগুলোকেই বা একাধিক মাধ্যমকেই আমরা আলাদাভাবে মাল্টিমিডিয়া বলব না। কাগজের প্রকাশনা বা রেডিয়োকে কেউ মাল্টিমিডিয়া বলতে চাইবেন না। বলা ঠিকও হবে না। টেলিভিশন-ভিডিয়ো-সিনেমাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি। আবার ভিডিয়ো গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বা ওয়েব পেজকে আমরা ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি।

মাল্টিমিডিয়া সচরাচর ডিজিটাল যন্ত্রের সহায়তায় ধারণ বা পরিচালনা করা যায়। এটি সরাসরি মঞ্চে প্রদর্শিত হতে পারে বা অন্যরূপে সরাসরি সম্প্রচারিতও হতে পারে। মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু ধারণ ও পরিচালনা করার ইলেকট্রনিক যন্ত্রকেও মাল্টিমিডিয়া নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কোনো একটি কর্মকাণ্ডে তিনটি মাধ্যমকেই একসাথে ব্যবহার করাকে মাল্টিমিডিয়া বলে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ১৮৯৫ সালে সিনেমা বা চলচ্চিত্র উদ্ভব হবার পর তাতে বর্ণ (text), চিত্র (graphics), শব্দ (sound) এবং চলমানতা (animation) যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমের পরস্পর সংলগ্ন হবার ব্যাপারটি ঘটতে থাকে যা মাল্টিমিডিয়ার একটি রূপ। আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ বলতে তাই সিনেমাকে স্মরণ করতে হবে। তবে প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের যুক্ত হবার সেই সূচনাকালটি অনেক আগের হলেও এসবের সাথে কম্পিউটারের যুক্ত হওয়া খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়।

মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ

আমরা সবাই জানি সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল যন্ত্র কম্পিউটার গণনা যন্ত্র বা হিসাব-নিকাশ করার যন্ত্র হিসেবেই সমধিক পরিচিত হয়ে আসছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগ কম্পিউটারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এরপর লেখালেখি করার জন্য এই যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়।

কিন্তু এতসব কাজ করার জন্য শুরুতে কম্পিউটারের একটি মাত্র মিডিয়া যথা- বর্ণ ব্যবহার করতে হতো। কিন্তু কালক্রমে কম্পিউটারে চিত্র এবং শব্দ সমন্বিত হয়। তাছাড়া কম্পিউটারের রয়েছে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। বস্তুত কম্পিউটারের মাল্টিমিডিয়া মানে হলো বর্ণ, চিত্র ও শব্দের সমন্বয়ে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অভিজ্ঞতা। অতীতের চাইতে এখনকার মাল্টিমিডিয়ার অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ। যন্ত্র হিসেবেও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার কেবল কম্পিউটারেই সীমাবদ্ধ নয় পাশাপাশি আমাদের হাতের কাছের মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্র এখন মাল্টিমিডিয়া ধারণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিমিডিয়ার প্রধান মাধ্যমসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো-

সারা পৃথিবীতে এখন সর্বপ্রথম যে প্রবণতাটি স্পর্শ করছে সেটি হচ্ছে প্রচলিত ধারণা ও প্রচলিত যন্ত্রপাতিকে কম্পিউটার দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা।

১. **বর্ণ বা টেক্সট:** সারা দুনিয়াতেই টেক্সটের যাবতীয় কাজ এখন কম্পিউটারে হয়ে থাকে। একসময় টাইপরাইটার দিয়ে এসব কাজ করা হতো, এখন অফিস-আদালত থেকে পেশাদারি মুদ্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে।

২. **চিত্র বা গ্রাফিক্স:** দুনিয়ার সর্বত্রই গ্রাফিক্স তৈরি, সম্পাদনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ কম্পিউটার ব্যবহার করেই করা হয়। আমাদের দেশে গ্রাফিক্স ডিজাইন, পেইন্টিং, ড্রইং বা কমার্শিয়াল গ্রাফিক্স নামক চারুকলার যে অংশটি রয়েছে তাতে কম্পিউটারের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। তবে একটি ব্যতিক্রমী এলাকা হচ্ছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা। মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় নব্বই দশকে। প্রথমে ফটোশপ দিয়ে স্ক্যান করা ছবি সম্পাদনা দিয়ে এর সূচনা হয়। ক্রমশ ডিজাইন এবং গ্রাফিক্সে কম্পিউটার জায়গা করে নিতে থাকে।

৩. **ভিডিয়ো :** ভিডিয়ো কার্যত এক ধরনের গ্রাফিক্স। একে চলমান গ্রাফিক্স বললে ভালো হয়। বিশ্বজুড়ে ভিডিয়ো একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া। টিভি, হোম ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার, ওয়েব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ভিডিয়োর ব্যবহার ব্যাপক।

৪. **এনিমেশন :** এনিমেশনও এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র, তবে সেটি চলমান বা স্থির হতে পারে, এটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে, আমাদের দেশে এনিমেশনের ব্যবহারও ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। বিশেষত বিজ্ঞাপন চিত্রে এনিমেশন একটি প্রিয় বিষয়, তবে এনিমেশনে কাজ করার লোকের অভাব রয়েছে। আসলে এনিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর সাথে অডিয়ো, ভিডিও, টেক্সট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে।

৫. **শব্দ বা অডিয়ো:** শব্দ বা অডিয়ো রেকর্ড, সম্পাদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সারা দুনিয়া এখন কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করে। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এনালগ পদ্ধতি এখন কার্যত সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। কম্পিউটার দিয়ে উন্নতমানের সাউন্ড রেকর্ডিং করা যায়।

৬. **ইন্টারঅ্যাকটিভ কম্পিউটিং :** ইন্টারঅ্যাকটিভিটি সম্পর্কে একটি কথা জানা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটি স্টাইল প্রয়োগ করলে যদি অক্ষরগুলো সুন্দর করে স্ক্রল বা ফ্লাস করে বা যদি ভিডিয়ো ফাইলে একটি ইফেক্ট যোগ করা হয় কিংবা এনিমেশন করলে যদি কিছু একটা পরিবর্তন হয় তাকে ইন্টারঅ্যাকটিভ বলা ঠিক হবে না। ফ্লাশ, ডিরেক্টর বা অথরওয়্যার-এর মতো শক্তিশালী অথরিং সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি ব্যবহারকারীর সাথে কম্পিউটারের মিথস্ক্রিয়া সম্ভব এমন কিছুকেই আমরা ইন্টারঅ্যাকটিভিটি বলব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহের নানান দিক উন্মোচিত হচ্ছে।

১. **শিক্ষার উপকরণ হিসেবে :** শিক্ষার উপকরণ হিসেবে বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। শ্রেণিকক্ষগুলো মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার হলে শিক্ষার্থী সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে। শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করতে পারেন। এছাড়া রয়েছে মাল্টিমিডিয়ার সফটওয়্যার।

১.১ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার: বাংলাদেশে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার প্রস্তুত হওয়া কেবল শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ-৭১, অবসর, বিশ্বকোষ, নামাজ শিক্ষা, বিজয় শিশু শিক্ষা- এমন কয়েকটি সিডিতে মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে প্রকৃত ইন্টারঅ্যাকটিভিটি এখনো নেই বললেই চলে। অবশ্য আশা করা হচ্ছে একুশ শতকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি হবেই।

১.২ ডিজিটাল প্রকাশনা: আমাদের প্রকাশনা এখনো কাগজনির্ভর। তবে একুশ শতক অবশ্যই ডিজিটাল প্রকাশনার শতক হবে বাংলাদেশেও।

২. **বিনোদন :** বিনোদনের অধিকাংশ এলাকায় মাল্টিমিডিয়া জুড়ে রয়েছে। সিনেমা বা নাটকের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার করে আরও প্রাণবন্ত করা হচ্ছে।

৩. **বিজ্ঞাপন :** বিজ্ঞাপনে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই দেখানো যাচ্ছে।

৪. **গেমস :** কম্পিউটার গেমস বা ভিডিয়ো গেমগুলোতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। গেমসগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা (Reality) ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে।

৫. **এনিমেশন:** এনিমেশন চলমান বা স্থির গ্রাফিক্স বা চিত্র। এটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে। বিজ্ঞাপন চিত্রে এনিমেশনের ব্যবহার একটি প্রিয় বিষয়। এনিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। অডিয়ো, ভিডিয়ো, টেক্সট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সমন্বয়ে সাধারণত এনিমেশন তৈরি হয়।

যিনি টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিয়ো, ভিডিয়ো, এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনিই মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস ডেভেলপার। এই কাজটি করার জন্য এডোবি ফটোশপ থেকে থ্রিডি স্টুডিয়ো ম্যাক্স বা মায়া ইত্যাদি অনেক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে আমরা তাদেরকেই মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার অথবা মাল্টিমিডিয়া অথর বলবো যারা এসব মিডিয়া ব্যবহার করে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন। বস্তুত কনটেন্টস ডেভেলপ করা ও ইন্টারঅ্যাকটিভিটি যোগ করার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। এডোবি প্রিমিয়ার বা এডোবি ফটোশপ এমন সফটওয়্যার, যা দিয়ে একটি চমৎকার কনটেন্টস তৈরি করা যায়। কিন্তু আমরা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম বলব ডিরেক্টরকে, যার সাহায্যে প্রিমিয়ার বা ফটোশপে তৈরি করা মিডিয়াগুলোকে মিলিয়ে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়।

আগামী দিনগুলোতে মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামারের চাহিদা এবং সংখ্যা কোনোটাই কম হবে না। বিজনেস সফটওয়্যার ও সার্ভিসেস-এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস ডেভেলপ করা ও প্রোগ্রামিং করতে পারা দক্ষ লোকের চাহিদা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বাড়ছে।

প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার

প্রেজেন্টেশন তৈরি করা

বর্তমান সময় হচ্ছে তথ্য বিনিময় এবং তথ্যের প্রবাহ অবারিত করে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার যুগ। এখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং পেশাজীবীদের মধ্যে তথ্য বিনিময় বা তথ্য আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করছে। সকল প্রকার তথ্যের ভাণ্ডার সকলের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সবাই তাঁদের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য প্রধানত প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় যেমন পাওয়ার পয়েন্ট, পিকাসা, ইমপ্রেস ইত্যাদি। পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের অন্তর্ভুক্ত একটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন। এ সফটওয়্যারটিকে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারও বলা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ প্রায় সকলের সুবিধার জন্য মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে লেখা, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, গ্রাফ ইত্যাদির সমন্বয়ে আকর্ষণীয়ভাবে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটি খুব সহজে এবং চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায়। এ দিক থেকে পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটির বিকল্প নেই বললেই চলে। এজন্যই সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে তথ্য উপস্থাপনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। পাওয়ার পয়েন্টে ফাইলকে বলা হয় প্রেজেন্টেশন।

প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে স্লাইড (slide) বলা হয়। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামে যেমন একটি ফাইলের মধ্যে অনেক পৃষ্ঠা থাকে, তেমনি একটি প্রেজেন্টেশনে একাধিক স্লাইড থাকে। একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে হ্যান্ড আউটস (handouts) বলা হয়। পরিকল্পিতভাবে একটি পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য খসড়া করে নিতে হয়। এই খসড়াকে বলা হয় Slide Layout।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলা এবং স্লাইড তৈরি করা

পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলার জন্য -

১. পর্দার নিচের দিকে বাম কোণে Start লেখা রয়েছে। এটি হচ্ছে স্টার্ট বোতাম।

২. Start বোতামের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু বা তালিকা আসবে।

৩. এ মেনুর All Programs কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

৪. এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে Microsoft Office মেনুতে ক্লিক করলে পাশেই আর একটি ফ্লাইআউট মেনুতে মাইক্রোসফট অফিস- এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে।

৫. এ তালিকা থেকে Microsoft Office Power Point কমান্ড সিলেক্ট করলে মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট-এর প্রথম স্লাইডের পর্দা উপস্থাপিত হবে। এ পর্দার মূল অংশে-

- বক্সের মধ্যে Click to add title এবং Click to add subtitle লেখা থাকবে। লেখা দুটির উপর ক্লিক করলে টেক্সট বক্স দৃশ্যমান হবে এবং টেক্সট বক্সের মধ্যে ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে। ইনসার্সন পয়েন্টার থাকা অবস্থায় শিরোনাম এবং উপ-শিরোনাম টাইপ করা যাবে। কিছু টাইপ না করে বক্সের বাইরে ক্লিক করলে আবার ওই দুটি লেখা দৃশ্যমান হবে।
- টেক্সট বক্সের বর্ডারে ক্লিক করে সিলেক্ট করার পর ডিলিট বোতামে চাপ দিলে লেখাসহ টেক্সট বক্স বাতিল হয়ে যাবে।

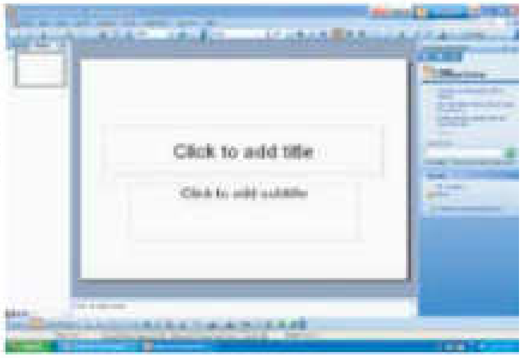

- Home মেনুর রিবন থেকে টেক্সট বক্স আইকন সিলেক্ট করে ইনসার্সন পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে পয়েন্টারটি টেক্সট পয়েন্টারের রূপ ধারণ করবে। এ অবস্থায় উপর থেকে নিচের দিকে কোনাকুনি টেনে বক্স তৈরি করতে হবে।
- বক্সের ভেতর ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে।
- বাংলায় টাইপ করার জন্য কীবোর্ডকে বাংলায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে।
- টুল বার ও রিবন থেকে ফন্ট, ফন্টের আকার-আকৃতি, রং ইত্যাদি সিলেক্ট করে টাইপের কাজ করতে হবে।
- সুতন্বীএমজে ফন্ট, সাইজ ১৫০, রং নীল সিলেক্ট করে টাইপ করা হলো 'আমাদের দেশ'।

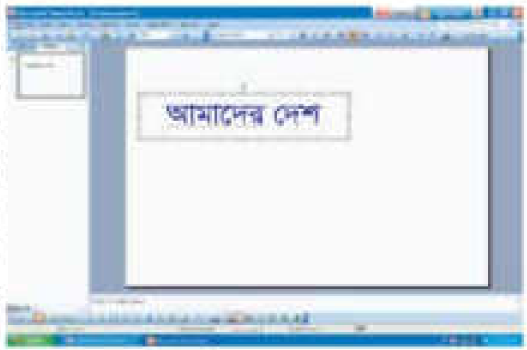

- টাইপ করার পর টেক্সট বক্সটি সিলেক্টেড থাকবে। সিলেক্টেড টেক্সট বক্সের চার বাহুতে চারটি এবং চার কোণে চারটি ছোটো গোলাকার ফাঁপা সিলেকশন পয়েন্ট থাকবে। এ সব সিলেকশন পয়েন্ট ড্রাগ করে বক্সের আকার ছোটো-বড়ো করা যাবে। লেখা সংকুলানের জন্য বক্সটি পাশাপাশি বা উপর-নিচে ছোটো-বড়ো করা যেতে পারে। বক্সের বাইরে ক্লিক করলে বক্সের সিলেকশন চলে যাবে।
- বক্সের যেকোনো বাহুর যেকোনো স্থানে ক্লিক ও ড্রাগ করে বক্সটি পর্দার যেকোনো অবস্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।
- স্লাইড তৈরির উইন্ডোর বাম পাশে থাম্বনেইল ভিউয়ে স্লাইডের ছোটো সংস্করণ দেখা যাবে।

প্রেজেন্টেশন সেভ বা সংরক্ষণ করা

- ফাইল মেনু থেকে Save কমান্ড দিলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।
- Save As ডায়ালগ বক্সের ফাইল নেম ঘরে ফাইলের নাম টাইপ করতে হবে, ধরা যাক, My Country.
- ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে। এতে প্রেজেন্টেশনটি My Country নামে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।
- অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তীতে My Country নামের প্রেজেন্টেশন ফাইলটি খুলে নিতে হবে।

নতুন স্লাইড যোগ করা

একটি প্রেজেন্টেশনে সাধারণত অনেক স্লাইড থাকতে পারে। নতুন স্লাইড যুক্ত করার জন্য-

১. Home মেনুর রিবন থেকে New Slide কমান্ড সিলেক্ট করলে বা কীবোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে M বোতামে চাপ দিলে একটি নতুন স্লাইড যুক্ত হবে।

- নতুন যুক্ত হওয়া স্লাইডে Click to add title এবং Click to add text লেখা থাকবে। পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে লেখা দুটি ডিলিট করে দিতে হবে বা বাতিল করে দিতে হবে। বাম পাশের থাম্বনেইল উইন্ডোতে নতুন যুক্ত হওয়া স্লাইডের ছোটো সংস্করণ দেখা যাবে।

২. পূর্ববর্ণিত নিয়মে একটি টেক্সট বক্সে নতুন স্লাইডের শিরোনাম টাইপ করতে হবে "একুশ থেকে একাত্তর"।

৩. একই নিয়মে তিনটি টেক্সট বক্সে ভিন্ন ভিন্নভাবে টাইপ করতে হবে

১৯৫২ সালের ২১ এ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালের ২৬ এ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এ দিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এ দিন মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

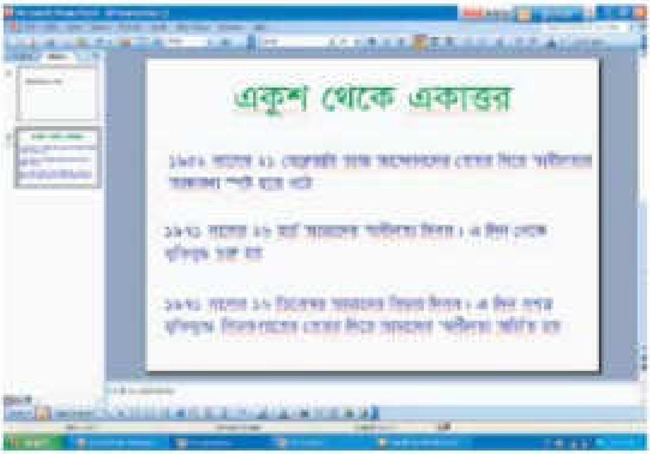

- বক্স তিনটি উপর থেকে নিচের দিকে পরপর স্থাপন করতে হবে। সবার উপরে থাকবে শিরোনাম। দ্বিতীয় স্লাইডটি যুক্ত করার নিয়মে আরও একটি স্লাইড যোগ করা যেতে পারে। এটি হবে তিন নম্বর স্লাইড।

তিন নম্বর স্লাইড যোগ করার জন্য-

৪. পূর্ববর্ণিত নিয়মে একটি টেক্সট বক্সে নতুন স্লাইডের শিরোনাম টাইপ করতে হবে "ধন্যবাদ"।

- এভাবে অনেকগুলো স্লাইড যুক্ত করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রেজেন্টেশন তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

- প্রাথমিকভাবে প্রেজেন্টেশন তৈরির পর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সমগ্র উপস্থাপনাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়।

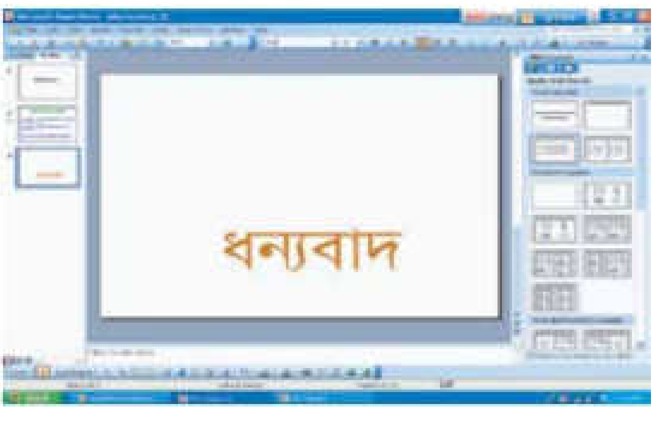

প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন

প্রেজেন্টেশনের জন্য দু একটি স্লাইড তৈরি করার পর দেখে নেওয়া যেতে পারে তৈরি স্লাইডগুলো যথাযথ হয়েছে কি-না। এ জন্য-

- কীবোর্ডের F5 বোতামে চাপ দিলে অথবা View মেনুর রিবন থেকে Slide Show সিলেক্ট করলে অথবা স্টাটাস বার-এ Slide Show আইকন ক্লিক করলে প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইডটি উপস্থাপিত হবে।
- প্রেজেন্টেশনের একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার জন্য কীবোর্ডের ডানমুখী তির বোতামে চাপ দিতে হবে। পূর্ববর্তী স্লাইডে ফেরার জন্য বামমুখী তীর বোতামে চাপ দিতে হবে।
- প্রেজেন্টেশনের মাঝামাঝি কোনো অবস্থানে থাকা অবস্থায় ওই স্লাইড থেকে পরবর্তী প্রদর্শন শুরু করার জন্য কীবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে F5 বোতামে চাপ দিতে হবে।
- স্লাইড শো উইন্ডো থেকে সম্পাদনার উইন্ডোতে ফিরে যাওয়ার জন্য কীবোর্ডের Esc বোতামে চাপ দিতে হবে।

কাজগুলো প্রত্যাশিতভাবে হচ্ছে কি-না দেখে নেওয়ার জন্য প্রেজেন্টেশন তৈরির যেকোনো পর্যায়ে স্লাইড প্রদর্শন করে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা

কোনো স্লাইড তৈরি করার সময় এবং স্লাইড তৈরির পরেও ব্যাকগ্রাউন্ডের রং পরিবর্তন করা যায়, নতুন করে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা যায়। যেকোনো ছবিকেও ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য বা ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করার জন্য-

১. যে স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে হবে সেই স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে বা সক্রিয় রাখতে হবে। বর্তমান প্রেজেন্টেশনে প্রথম স্লাইডটি খোলা রাখা হলো।

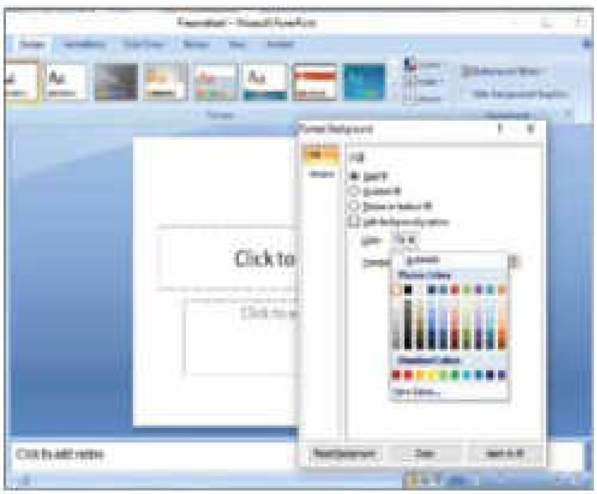

২. Design মেনুর রিবনে একেবারে ডান দিকে Background Style ড্রপ-ডাউন বার-এ ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট এবং সলিড রঙের একটি প্যালেট আসবে। এ প্যালেটের যে কোনো রং বা গ্রেডিয়েন্টের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করা হলে মূল স্লাইডে সেই রং বা গ্রেডিয়েন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাবে।

ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আরও রং, টেক্সচার এবং ছবি ব্যবহার করার জন্য-

১. প্যালেটের নিচের দিকে Format Background সিলেক্ট করতে হবে। এতে Format Background ডায়ালগ বক্স আসবে।

২. Format Background ডায়ালগ বক্সের উপরের বাম পাশে Solid fill রেডিয়ো বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিতে হবে। এরপর Color ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে রঙের প্যালেট আসবে। এ রঙের প্যালেট থেকে যে রঙের সোয়াচের উপর ক্লিক করা হবে স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সেই রং আরোপিত হবে।

৩. Picture or Texture fill রেডিয়ো বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে Color -এর জায়গায় Texture ড্রপ-ডাউন আসবে। এ ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রকার টেক্সার প্রদর্শিত হবে। এর ভেতর থেকে যে টেক্সচারের সঙ্গে ক্লিক করা হবে, মূল স্লাইডে সেই টেক্সচার আরোপিত হবে।

৪. Picture or Texture fill রেডিয়ো বোতাম সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় Insert from-এর নিচে File বোতামে ক্লিক করলে Insert Picture ডায়ালগ বক্স আসবে।

ডায়ালগ বক্সের যে ফোল্ডারে ছবি আছে সেই ফোল্ডার খুলে ছবি নির্বাচন করতে হবে।

৫. ডায়লগ বক্সের Insert বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং ওই ছবি স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আরোপিত হবে।

আরোপিত ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে ফেলতে Format Background ডায়লগ বক্সের Solid fill রেডিয়ো বোতামে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিতে হবে। এরপর Color ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে রঙের প্যালেট আসবে। এ রঙের প্যালেট থেকে সাদা রং সিলেক্ট করতে হবে।

৬. ডায়ালগ বক্সের Close বোতামে ক্লিক করতে হবে।

স্লাইডে ছবি যুক্ত করা

অনেক সময় স্লাইডে ছবি যুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। স্লাইডে ছবি যুক্ত করার জন্য-

১. Insert মেনুর রিবনে Picture আইকনের উপর ক্লিক করলে Insert Picture ডায়ালগ বক্স আসবে।

২. Insert Picture ডায়ালগ বক্সের যে ফোল্ডারে প্রয়োজনীয় ছবিটি রয়েছে, সেই ফোল্ডার খুলতে হবে এবং ছবিটি সিলেক্ট করে ডায়ালগ বক্সের Insert বোতামে ক্লিক করতে হবে। সিলেক্ট করা ছবিটি স্লাইডে চলে আসবে।

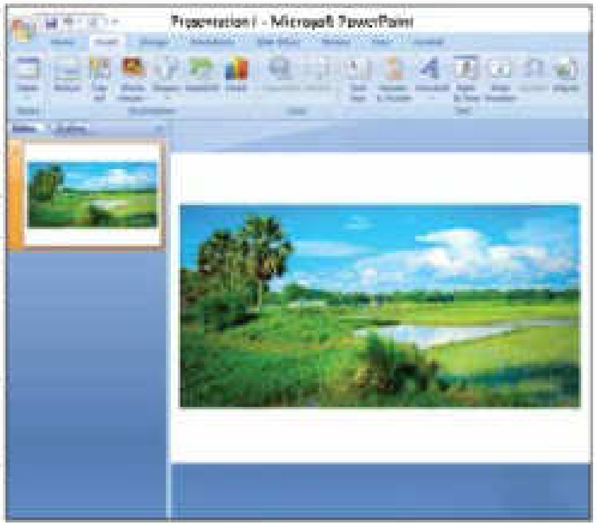

৩. ছবিটির রিসাইজ বক্সে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ছবির আকার ছোটো-বড়ো করা যাবে এবং ছবিটি ড্র্যাগ করে যে অবস্থানে প্রয়োজন সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

স্লাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করা

সাধারণত একটির পর একটি করে স্লাইড প্রদর্শন করা হয়। অনেক সময় একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার সময় ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। এই ইফেক্টকে বলা হয় ট্রানজিশন। প্রেজেন্টেশনের যে স্লাইডটি খোলা রেখে ট্রানজিশন প্রয়োগ করা হয় সেই স্লাইডটিতেই ট্রানজিশন কার্যকর হয়। প্রথম স্লাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করার জন্য-

১. প্রথম স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে।

২. Animations মেনুতে ক্লিক করে সক্রিয় করতে হবে।

Animations মেনুর রিবনে এক সারি স্লাইড ট্রানজিশনের নমুনা পাওয়া যাবে।

যে নমুনার উপরে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করা হবে, স্লাইডে সেই নমুনার ট্রানজিশন দেখা যাবে। আরও নমুনা থেকে বাছাই করার জন্য নমুনাগুলোর ডান দিকে তিনটি তীর রয়েছে। মাঝখানের তীরে ক্লিক করতে থাকলে নমুনার নতুন একটি করে সারি আসতে থাকবে। উপরের তীরে ক্লিক করলে উপর থেকে নিচের দিকে একটি সারি নেমে আসবে। নিচের তীরে ক্লিক করলে সবগুলো নমুনা একসঙ্গে দেখা যাবে। এভাবে ট্রানজিশনের নমুনাগুলো দেখে নেওয়া যাবে। পছন্দ হলে নমুনাটির উপর ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করা হলে ওই ট্রানজিশনটি স্লাইডে আরোপিত হবে।

৩. সবগুলো স্লাইডে একই ট্রানজিশন আরোপ করতে হলে, প্রথম স্লাইডে ট্রানজিশন আরোপ করার পর নমুনার সারির ডান দিকে Apply To All বোতামে ক্লিক করতে হবে।

৪. প্রতিটি স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে হলে একটি একটি করে প্রতিটি স্লাইডে ট্রানজিশন আরোপ করতে হবে।

লেখায় স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করা

একটি স্লাইডে একাধিক টেক্সট বক্সে লেখা থাকতে পারে। বর্তমান প্রেজেন্টেশনের দ্বিতীয় স্লাইডে তিনটি টেক্সট বক্সে লেখা রয়েছে। তিনটি টেক্সট বক্সে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশন প্রয়োগ করলে টেক্সট বক্সগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্লাইডের ভেতরে আসবে। টেক্সট বক্সে ট্রানজিশন প্রয়োগের জন্য-

১. দ্বিতীয় স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে।

২. প্রথম টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করতে হবে।

৩. Animations মেনুতে ক্লিক করে সক্রিয় করতে হবে।

Animations-এর নিচে Custom Animation নামে একটি কমান্ড যুক্ত হবে। Custom Animation-এর উপর ক্লিক করলে Custom Animation-এর একটি প্যালেট আসবে।

৪. Custom Animation প্যালেটের Add Effect ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Entrance সিলেক্ট করলে কাস্টম ট্রানজিশনের একটি তালিকা আসবে। এ তালিকা থেকে-

- প্রথম টেক্সট বক্সের জন্য Blinds সিলেক্ট করা হলো।
- দ্বিতীয় টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Fly in সিলেক্ট করা হলো।
- তৃতীয় টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Diamond সিলেক্ট করা হলো।
- এ তালিকা থেকে More Effects সিলেক্ট করলে ট্রানজিশনের আরও একটি তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে যেকোনো ট্রানজিশন সিলেক্ট করলে একই রকম কাজ হবে।

৫. আরোপিত কোনো ট্রানজিশন বাদ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Remove বোতামে ক্লিক করতে হবে।

ট্রানজিশনে শব্দ প্রয়োগ করা

স্লাইড ট্রানজিশনের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করার জন্য স্লাইডটি খোলা রেখে Transition Sound ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে যেকোনো একটি শব্দের নাম সিলেক্ট করতে হবে। প্রথম স্লাইডের জন্য Camera সিলেক্ট করা হলো। সবগুলো স্লাইডে একই শব্দ প্রয়োগ করার জন্য Apply To All বোতামে ক্লিক করতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করার জন্য প্রতিটি স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন করে একই নিয়মে শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।

স্লাইডে ভিডিয়ো যুক্ত করা

প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো স্লাইডে ভিডিয়ো যুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণত শুরুর স্লাইডে ভিডিয়ো যুক্ত করা হয়। ধরা যাক, 'আমাদের দেশ' উপস্থাপনার শুরুর স্লাইডে একটি ভিডিয়ো যুক্ত করতে হবে। এ জন্য-

- 'আমাদের দেশ' উপস্থাপনাটির প্রথম স্লাইড খোলা রাখতে হবে।
- Insert মেনুর রিবনে Movie ড্রপ-ডাউনে ক্লিক করলে Movie from file কমান্ড পাওয়া যাবে। Movie from file কমান্ড সিলেক্ট করলে Insert Movie ডায়ালগ বক্স আসবে।
- Insert Movie ডায়ালগ বক্সের ভিডিয়ো ফোল্ডার থেকে একটি মুভি ফাইল সিলেক্ট করতে হবে।
- ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- একটি জিজ্ঞাসাসূচক বার্তা বক্স আসবে "How do you want the movie to start in the slide show?"
- বার্তা বক্সে দুটি বোতাম থাকবে- Automatically এবং When Clicked.
- প্রয়োজনীয় বোতামে ক্লিক করলে বার্তা বক্স চলে যাবে এবং স্লাইডে ভিডিয়ো ফাইল স্থাপিত হবে। ফাইলটি ড্রাগ করে যেকোনো স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে এবং ফাইলের রিসাইজ বক্স ড্রাগ করে ফাইলটির আকার ছোটো-বড়ো করা যাবে।
- কীবোর্ডের F5 বোতামে ক্লিক করলে প্রথম স্লাইডটি প্রদর্শিত হবে।
- স্লাইডে ভিডিয়ো ফাইলের থাম্বনেইল দৃশ্যমান থাকবে।
- ভিডিয়ো ফাইলের থাম্বনেইলে ক্লিক করলে ভিডিয়োটি চালু হয়ে যাবে। মুভি ফাইলটি সংযোজন করার সময় Automatically সিলেক্ট করা থাকলে স্লাইড প্রদর্শন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুভিটিও চালু হয়ে যাবে।

কাজ

তোমার বিদ্যালয় নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করে উপস্থাপন কর।

গ্রাফিক্স

গ্রাফিক্সের গুরুত্ব

কম্পিউটারের সাহায্যে ছবি সম্পাদনা করার জন্য ক্যামেরায় তোলা ছবি, হাতে আঁকা ছবি বা চিত্রকর্ম, নকশা ইত্যাদি স্ক্যান করে কম্পিউটারে ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ছবি সরাসরি কম্পিউটারে কপি করে নেওয়া যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে ছবি সম্পাদনার পর এগুলো ডিজিটাল মাধ্যমে এবং কাগজে ছাপার জন্য আমন্ত্রণপত্র, পোস্টার, ব্যানার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

কম্পিউটারে ছবি সম্পাদনার জন্য অনেক রকম প্রোগ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সুবিধা ও অভিজ্ঞতার বিবেচনায় তাই এখানে এডোবি ফটোশপ এবং এডোবি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে আলোচনা করা হলো। ছবি বা ছবির কোনো অংশের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো-কমানো, একাধিক ছবির সমন্বয়ে বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করা, ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে ফেলা, ছবির দাগ বা ত্রুটি মুছে ফেলা ইত্যাদি আরও নানা রকম কাজ এডোবি ফটোশপ দিয়ে করা যায়।

ফটোশপে কাজ করার জন্য আমাদের কম্পিউটারে ফটোশপ প্রোগ্রাম ইন্সটল করা থাকতে হবে অথবা তা ইন্সটল করে নিতে হবে। আগে শেখা অন্যান্য প্রোগ্রামের মতো একই পদ্ধতিতে ফটোশপ প্রোগ্রাম খুলতে হয়। নতুন ফাইল তৈরি করে অথবা আগে তৈরি করা ফাইল খুলে কাজ শুরু করতে হয়।

ফটোশপ প্রোগ্রাম খোলার জন্য–

১. Start বা Windows Logo Button এ Click করে অল প্রোগ্রামস (All Programs) কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

২. এ মেনু থেকে এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামের নামের উপর ক্লিক করলে এডোবি ফটোশপ (Adobe Photoshop) প্রোগ্রাম খুলে যাবে।

ফটোশপ প্রোগ্রামে নতুন ফাইল তৈরি করার জন্য-

- ফটোশপ প্রোগ্রাম খোলার পর File মেনু থেকে New কমান্ড দিলে New ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- নিউ ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Untitled-1 লেখাটি সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে। কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস বোতামে চাপ দিয়ে লেখাটি মুছে ফেলতে হবে এবং একটি নাম টাইপ করতে হবে। এটিই হবে ফাইলের নাম। ধরা যাক, Name ঘরে Practice টাইপ করা হলো।

  এ পর্যায়ে ফাইলের নাম টাইপ করে নিলে পরবর্তীতে ফাইলটি বন্ধ করার সময় আর নতুন করে নাম টাইপ করতে হবে না। অন্যথায়, ফাইল বন্ধ করার সময় নাম টাইপ করার জন্য ডায়ালগ বক্স আসবে।
- নিউ ডায়ালগ বক্সে প্রশস্ততা বা Width এবং উচ্চতা বা Height ঘরে ইঞ্চির মাপে সংখ্যা টাইপ করতে হবে। যেমন- প্রশস্ততা ৭ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৮ ইঞ্চি টাইপ করতে হবে। এ দুটি ঘরের ডান পাশে মাপের একক নির্ধারণের ড্রপ-ডাউন মেনু রয়েছে। এ মেনুর নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে মাপের

এককগুলো দেখা যাবে। যেমন - Inches, Pixels, Picas, Points, cm এবং mm. এ ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে প্রয়োজনীয় একক সিলেক্ট করতে হবে। শুরুতে হয়ত পিক্সেল থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মে ইঞ্চির মাপ নির্ধারণ করতে হবে। ধরা যাক, বর্তমান কাজের জন্য একক হিসেবে Inches নির্ধারণ করে প্রশস্ততা ঘরে ৭ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ঘরে ৮ ইঞ্চি টাইপ করা হলো।

- আপাতত রেজুলিউশন ৭২ পিক্সেল অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

ফটোশপে ইমেজ বা ছবি তৈরি হয় পিক্সেলের সাহায্যে। পিক্সেল হচ্ছে একটি ইমেজ বা ছবির বর্গাকার ক্ষুদ্রতম একক। ইঞ্চি প্রতি ৭২ পিক্সেল কথাটির অর্থ হচ্ছে এক ইঞ্চিতে আড়াআড়ি এবং উলম্বভাবে ৭২টি পিক্সেলের ৭২টি করে লাইন। এতে এক বর্গ ইঞ্চিতে মোট পিক্সেলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭২x৭২=৫১৮৪ পিক্সেল। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বা নির্দিষ্ট এককে পিক্সেলের পরিমাণকেই রেজুলিউশন বলা হয়। পিক্সেলের ঘরে ১৩০ টাইপ করলে রেজুলিউশন হবে ১৩০x১৩০=১৬,৯০০ পিক্সেল। একটি ছবি বড় করলে পিক্সেলগুলো দেখা যাবে। এ অবস্থাকে বলা হয় পিক্সেলেটেড হয়ে যাওয়া। সাধারণ ভাষায় বলা হয় ছবি ফেটে যাওয়া।

- ডায়ালগ বক্সের Color Mode ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে RGB, CMYK, Bitmap, Grayscale), Lab Color-এর ভেতর থেকে RGB সিলেক্ট করা যেতে পারে। কারণ, কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মনিটরে উপস্থাপিত বিষয় প্রদর্শিত হয় RGB মোডে। RGB হচ্ছে Red,Green এবং Blue বা লাল,সবুজ এবং নীল এই তিনটি রঙের ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত রূপ।
- ডায়ালগ বক্সের Background Contents অংশে ব্যাকগ্রাউন্ডের ৩টি অপশন রয়েছে। অপশন ৩টি হচ্ছে সাদা বা White, Background Color এবং স্বচ্ছ বা Transparent.
- ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে সাদা বা White সিলেক্ট করলে ক্যানভাস বা Background-এর রং হবে সাদা, Background Color সিলেক্ট করলে ক্যানভাস বা Background-এর রং হবে টুল বক্সে ব্যাকগ্রউন্ডের রং হিসেবে বিদ্যমান রং বিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ বা Transparent সিলেক্ট করলে ক্যানভাস বা Background স্বচ্ছ থাকবে। স্বচ্ছ Background-এর পুরোটাই হবে রংবিহীন চেকবিশিষ্ট। পছন্দ বা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকগ্রাউন্ডের অপশন সিলেক্ট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাদা বা White সিলেক্ট করা যেতে পারে।
- উপরে বর্ণিত ধাপসমূহ সম্পন্ন না করে সরাসরি Preset ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Default Photoshop Size সিলেক্ট করা যেতে পারে। এতে ফটোশপের নিজস্ব মাপ অনুযায়ী সবগুলো একক নির্ধারিত হয়ে যাবে। কাজ শেখার প্রথম পর্যায়ে Default Photoshop Size সিলেক্ট করা যেতে পারে।
- ডায়ালগ বক্সের মাপজোক নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করে OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- ডায়ালগ বক্সে প্রদত্ত মাপ অনুযায়ী একটি উইন্ডো বা পর্দা আসবে। পর্দার উপরের বাম দিকে Practice @ ১০০% (RGB/8) লেখা থাকবে। এ বারটিকে বলা হয় টাইটেল বার। নিউ ডায়লগ বক্সের Name ঘরে ফাইলটির জন্য কোনো নাম ব্যবহার না করা হলে টাইটেল বার-এর এ জায়গাটিতে ফাইলের নাম হিসেবে Untitled-1@ ১০০% (RGB/8) প্রদর্শিত হবে।
- টাইটেল বার-এর উপর ডবলক্লিক করলে টাইটেল বারটি পর্দার উপরে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।
- টাইটেল বার-এর নিচে মেনু বার এবং মেনু বার-এর নিচে রয়েছে অপশন বার।
- অপশন বার-এর নিচে রয়েছে রুলার।

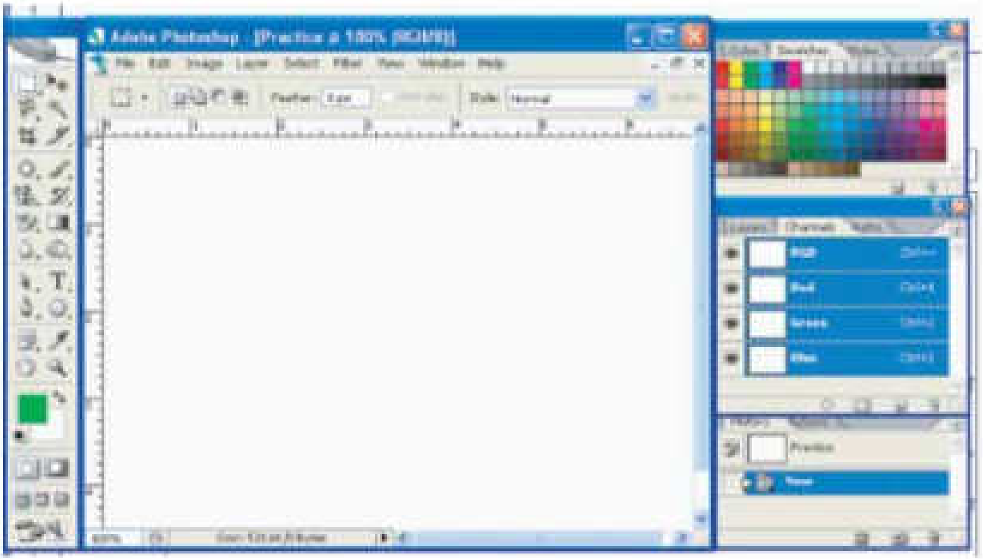

- রুলারের নিচের পর্দায় ফটোশপের কাজ করতে হয়।
- এ পর্দাটিকে শিল্পীর ছবি আঁকার ক্যানভাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই ক্যানভাসের বাম পাশে রয়েছে তুলি বা ব্রাশ এবং রং ও ছবি সম্পাদনা করার বিভিন্ন প্রকার টুল এবং ডান পাশে রয়েছে প্যালেট।

ফটোশপের টুলবক্স এবং প্যালেট পরিচিতি

ফটোশপে কাজ করার জন্য কমবেশি ৬৯ প্রকার টুল রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অপশন প্যালেট, ডায়ালগ বক্স ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম টুলের সঙ্গে আবার বিভিন্ন রকম অপশন প্যালেট এবং ডায়ালগ বক্সের সম্পর্ক রয়েছে।

ফটোশপের টুল বক্সে এ ছাড়াও রয়েছে তুলি বা ব্রাশের রং বা Foreground এবং ক্যানভাস বা Background-এর রং নিয়ন্ত্রণের আইকন, মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন এলাকা নির্ধারণের আইকন, মাস্ক আইকন ইত্যাদি। পেন্সিল বা ব্রাশ টুল দিয়ে রেখা অঙ্কন করলে Foreground-এর রং তুলির রং হিসেবে কাজ করে।

- পর্দার ডান পাশে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার প্যালেট। প্যালেটের উপরের ডান দিকে বিয়োগ চিহ্ন বা Minimize আইকন রয়েছে। এ বিয়োগ চিহ্ন বা Minimize

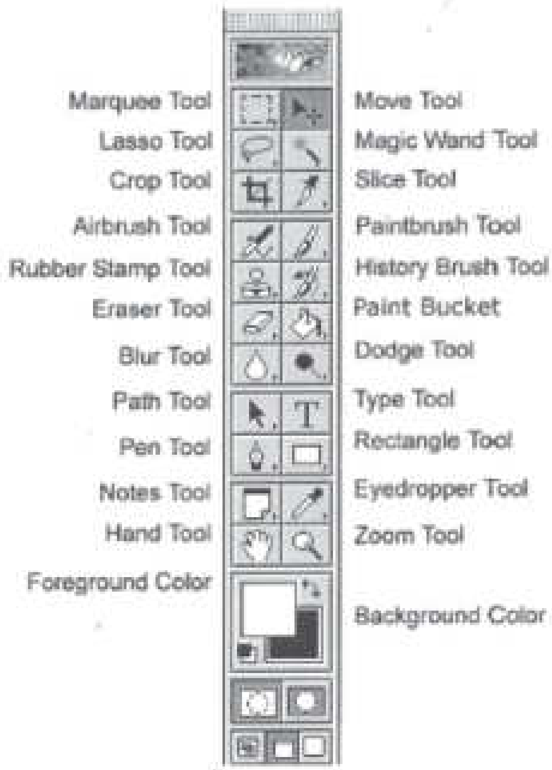

আইকনে ক্লিক করলে প্যালেটটি গুটিয়ে যাবে এবং আইকনটি চতুষ্কোণ বা Maximize আইকনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। গুটিয়ে থাকা প্যালেটের চতুষ্কোণ বা Maximize আইকনে ক্লিক করলে প্যালেটটি আবার সম্প্রসারিত হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আবার বিয়োগ চিহ্ন বা Minimize আইকনে ক্লিক করলে প্যালেটটি গুটিয়ে যাবে।

- প্যালেটের টপ বার-এ ডাবলক্লিক করলেও সম্প্রসারিত প্যালেট গুটিয়ে যাবে এবং গুটিয়ে থাকা প্যালেট সম্প্রসারিত হবে।
- প্যালেটের টপ বার-এ ক্লিক ও ড্র্যাগ করে প্যালেটকে যেকোনো স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যায়।
- পর্দার বাম দিকে রয়েছে টুল বক্স। এতে বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টুল রয়েছে। কাজের জন্য যে টুলের উপর যখন ক্লিক করা হয় তখন সেই টুলটি সক্রিয় হয়। টুল বক্সে কোনো টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে কখনো ওই টুলের নিজস্ব আকৃতিতে দেখা যায়, আবার কখনো যোগ চিহ্নরূপে দেখা যায় এবং সম্পাদনা টুলগুলো বৃত্ত বা গোল আকৃতি হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

সিলেকশন টুল এবং মুভ টুল পরিচিতি

- টুল বক্সের একেবারে উপরের অংশে রয়েছে ৩টি সিলেকশন টুল এবং একটি মুভ টুল। কিছু টুলের নিচের ডান দিকে ছোটো তীর চিহ্নের ∠ রয়েছে। এতে বোঝা যাবে ওই সকল টুলের একই অবস্থানে একই গোত্রের আরও টুল রয়েছে। যেমন- একই অবস্থানে রয়েছে চারটি মার্কি টুল এবং অন্য অবস্থানে রয়েছে তিনটি লাসো টুল।
- টুলের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে টুলের নাম প্রদর্শিত হবে। মাউস পয়েন্টার দিয়ে ওই টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সক্রিয় হবে। এ অবস্থায় মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে সিলেক্টেড টুলের নিজস্ব আকৃতিতে বা যোগচিহ্ন রূপে দেখা যাবে।
- সিলেকশন টুলের মধ্যে মার্কি টুল দিয়ে চতুষ্কোণ ও বৃত্তাকার সিলেকশন এবং অবজেক্ট তৈরির কাজ করা যায়।
- Shift বোতাম চেপে রেখে Rectangular Marquee Tool ড্র্যাগ করলে নিখুঁত বর্গ এবং Shift বোতাম চেপে রেখে Elliptical Marquee Tool ড্র্যাগ করলে নিখুঁত বৃত্ত সিলেকশন তৈরি হবে। Alt বোতাম চেপে ড্র্যাগ করলে কেন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে বর্গ/ বৃত্ত সিলেকশন তৈরি হবে।

সিলেকশন স্থানান্তরিত করা

- Rectangular Marquee Tool-এর সাহায্যে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সিলেকশন রেখা তৈরি করার পর মাউস থেকে আঙুল তুলে নিলে পর্দায় চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সিলেকশন রেখা ভাসমান অবস্থায় থাকবে।
- মাউস পয়েন্টার সিলেকশনের ভেতরে নিয়ে গেলে মাউস পয়েন্টারের নিচের দিকে ছোটো একটি আয়তকার আইকন দেখা যাবে। এ অবস্থায় মাউসে আঙুলের চাপ রেখে ভাসমান সিলেকশনকে ড্র্যাগ করে যে কোনো স্থানে সরিয়ে নেওয়া যাবে।
- সিলেকশন ভাসমান থাকা অবস্থায় Select মেনুর Deselect কমান্ড সিলেক্ট করলে অথবা সিলেকশনের বাইরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে সিলেকশন চলে যাবে।

ভাসমান সিলেকশনটি রং দিয়ে পূরণ করা

- টুল বক্সের নিচের অংশে Foreground এবং Background কালার আইকন রয়েছে। উপরের আইকনটি হচ্ছে Foreground-এর এবং নিচের আইকনটি হচ্ছে Background- এর। কোনো সিলেকশন ভাসমান থাকা অবস্থায় রং দিয়ে পূরণ করার জন্য–

- কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রেখে Backspace বোতামে চাপ দিলে সিলেকশনটি তুলির রং বা Foreground-এর রঙে পূরণ হয়ে যাবে এবং Ctrl বোতাম চেপে রেখে Backspace বোতামে চাপ দিলে বা শুধু Backspace বোতামে চাপ দিলে ক্যানভাসের রং বা Background-এর রঙে পূরণ হয়ে যাবে।
- রঙে পূরণ হওয়া সিলেকশনটি ভাসমান থাকবে। প্রয়োজন হলে ড্র্যাগ করে অন্য স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।
- সিলেকশন সরিয়ে নেওয়ার সময় রং দিয়ে পূরণ করা অবজেক্ট পূর্ববর্তী স্থানেই থেকে যাবে।
- Ctrl বোতাম চেপে রেখে স্থানান্তরিত করলে অবজেক্টটি কাট হয়ে স্থানান্তরিত হবে।
- Ctrl ও Alt বোতাম একসঙ্গে চেপে রেখে স্থানান্তরিত করলে অবজেক্টটি কপি হয়ে স্থানান্তরিত হবে।
- ভাসমান সিলেকশনের বাইরে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে সিলেকশনটি চলে যাবে।

ফেদার-এর ব্যবহার

- অপশন বার-এ Feather ঘরে ০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করে অবজেক্টের প্রান্ত নমনীয় করা যায়। ফেদারের পরিমাণ অবজেক্টের প্রান্ত থেকে ভেতর ও বাইরের দিকে সমানভাবে বিস্তৃত হয়। ফেদার ঘরে ১০ টাইপ করলে প্রান্তের নমনীয়তা হবে ২০।
- ফেদার ঘরে বিভিন্ন পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করার পর কীবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিয়ে ফেদার বৈশিষ্ট্যকে কার্যকর করে নিতে হবে। এরপর মার্কি টুল বা অন্য টুল দিয়ে তৈরি করা রং দিয়ে পূরণ করলে ফেদার বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হবে। কপি বা কাট করা অবজেক্ট পেস্ট করার পরও ফেদার বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হবে।

ল্যাসো টুল ও পলিগোনাল ল্যাসো টুলের সাহায্যে সিলেক্ট করা

টুল বক্সের ল্যাসো টুল সিলেক্ট করতে হবে। ল্যাসো টুল দিয়ে কয়েক প্রকার সিলেকশন তৈরি করা যেতে পারে। যেমন –

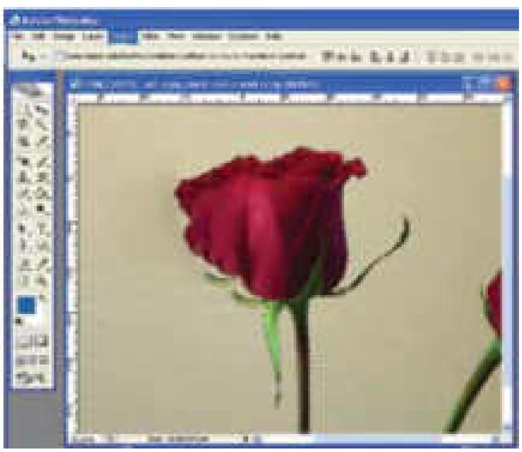

- মুক্ত সিলেকশন তৈরি করার জন্য Lasso Tool সিলেক্ট করার পর ক্যানভাসে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অবৃত্তাকার এবং আঁকাবাঁকা সীমানা বা প্রান্তবিশিষ্ট সিলেকশন তৈরির কাজ করা যায়। ড্র্যাগ করা অবস্থায় মাউসের উপর থেকে আঙুলের চাপ ছেড়ে দিলে ঐ অবস্থান থেকে শুরুর ক্লিকের বিন্দুর সঙ্গে রেখা তৈরি হয়ে বন্ধ সিলেকশন তৈরি হবে।

২০১৮

- সিলেকশন ভাসমান (Floating) থাকা অবস্থায় সিলেকশনের মধ্যে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে অন্যত্র সরিয়ে স্থাপন করা যাবে। সিলেকশন কোনো রং দিয়ে পূরণ (Fill) করার পরও ভাসমান সিলেকশন ড্র্যাগ করে অন্যত্র সরিয়ে স্থাপন করে একই রং বা অন্য কোনো রং দিয়ে পূরণ করা যাবে।
- রঙের গাঢ়ত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ওপাসিটি (Opacity) ব্যবহার করা হয়।
- Edit মেনুর Fill কমান্ড দিলে পর্দায় ফিল ডায়ালগ বক্স পাওয়া যায়।
- ফিল ডায়ালগ বক্সের কনটেন্টস অংশে ইউজ ঘরে ফোরগ্রাউন্ড সিলেক্টেড থাকে। প্রয়োজন হলে ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।
- ডায়ালগ বক্সের ওপাসিটি ঘরে রঙের গাঢ়ত্ব নির্ধারণী সংখ্যা টাইপ করতে হয়। রঙের পূর্ণ গাঢ়ত্ব হচ্ছে ১০০%। শতকরা হার (%) যত কম হবে রং ততই হালকা হবে। ওপাসিটি ঘরে ৫০ টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে সিলেকশনটি ফোরগ্রাউন্ড রঙের ৫০% গাঢ়তায় পূরণ হবে।
- সিলেকশনের অপশন প্যালেটেও ওপাসিটি আছে। এ প্যালেটের ওপাসিটি কমবেশি করেও পূরণ করা রঙের গাঢ়তা কমবেশি করা যায়।

স্ট্রোক

- স্ট্রোক কমান্ডের সাহায্যে সিলেকশনের বর্ডার তৈরি করা যায়।
- সিলেকশন ভাসমান থাকা অবস্থায় Edit মেনুর Stroke কমান্ড সিলেক্ট করলে Stroke ডায়ালগ বক্স পাওয়া যায়।
- ডায়ালগ বক্সের Stroke Width ঘরে ১-১৬ পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা টাইপ করা যায়। এ সংখ্যা অনুযায়ী বর্ডারের প্রশস্ততা নির্ধারিত হয়। বর্ডারটি সিলেকশনের বাইরের দিকে, ভেতরের দিকে বা মাঝামাঝি স্থানে তৈরির জন্য- ডায়ালগ বক্সের Outside, Inside বা Center সংযুক্ত গোলক বা Radio button-এর মাঝখানে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিতে হবে।
- ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে।
- স্ট্রোক পদ্ধতিতে শুধু তুলির রং বা ফোরগ্রাউন্ডের রং দিয়েই বর্ডার তৈরি করা যায়।

ফাইল সেভ বা সংরক্ষণ বন্ধ করা

- ফাইল মেনু থেকে Save কমান্ড দিলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে।
- সেভ অ্যাজ (Save As) ডায়ালগ বক্সের ফাইল নেম ঘরে ফাইলের নাম টাইপ করতে হবে, ধরা যাক, Practice.
- ডায়ালগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করতে হবে। এতে ফাইলটি Practice নামে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।
- অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তীতে Practice ফাইলটি খুলে নিতে হবে।

লেয়ার

অবজেক্ট তৈরি করা এবং ছবি সম্পাদনার কাজ শুরু করার আগে Layer সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ছবি সম্পাদনার প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে Layer-এর মাধ্যমে কাজ করতে হয়।

Layer হচ্ছে, ছবি সম্পাদনার পর্দা বা ক্যানভাসের একেকটি স্তর। লেয়ার পদ্ধতিতে একাধিক স্বচ্ছ ক্যানভাস একটির উপরে একটি রেখে কাজ করা যায়। ক্যানভাস স্বচ্ছ হলে প্রতি স্তরে বিদ্যমান ছবি দেখে দেখে কাজ করা যায়। কিন্তু উপরের স্তরের ক্যানভাসটি স্বচ্ছ না হলে নিচের ক্যানভাসের কাজ দেখা যাবে না। রঙিন ব্যাকগ্রাউন্ড বিশিষ্ট কোনো ছবি খোলা হলে ওই ছবির লেয়ার প্যালেটে Background লেখা থাকবে। ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা রঙের হলেও স্বচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ড হবে না। কারণ, সাদা একটি রং। উদাহরণ হিসেবে-

- একটি ফুলের ছবি বিশিষ্ট একটি ফাইল খোলা হলো। ছবির লেয়ার প্যালেটে Background লেখা রয়েছে। লেয়ার বার-এর ডান দিকে একটি তালার আইকন রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে লেয়ারটি লক করা আছে। লক করা লেয়ারের অবজেক্ট মুভ টুলের সাহায্যে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে স্থানান্তরিত করা যায় না।
- নতুন ফাইল খোলার সময় Background Content হিসেবে হোয়াইট বা সাদা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা হলে লেয়ার প্যালেটে Background প্রদর্শিত হবে।

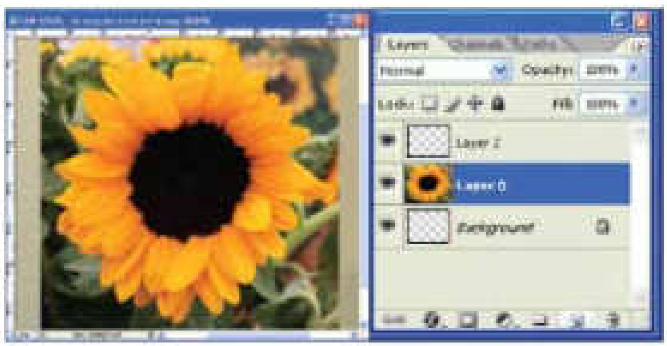

- বর্তমান উদাহরণের ফুলের ছবিটি এদিক-সেদিক সরিয়ে স্থাপন করার জন্য Background-কে লেয়ারে পরিণত করে নিতে হবে। এ জন্য–
- লেয়ার প্যালেটে Background-এর উপর ডাবলক্লিক করলে New Layer নামে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Layer 0 থাকবে। ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং Background লেখার Layer 0-এ পরিণত হবে। ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Layer 0 মুছে Layer 1 টাইপ করলে Background লেয়ারটি Layer 1-এ পরিণত হবে।
- Background Eraser টুল দিয়ে ছবির যেকোনো অংশে ক্লিক করলে ছবির ওই অংশ মুছে যাবে এবং প্যালেটের লেয়ারটি আপনাআপনি Layer 0-এ পরিণত হবে।
- Eraser টুল দিয়ে ছবির কোনো অংশ মোছা হলে লেয়ারটি Layer 0-এ পরিণত হবে না।

নতুন লেয়ার যুক্ত করা

ফটোশপে একাধিক ছবির ফাইল নিয়ে কাজ করার জন্য একাধিক লেয়ার ব্যবহার করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন ছবি ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারে রেখে তাদের অবস্থান বিন্যাসসহ অন্যান্য সম্পাদনার কাজ করতে হয়।

প্যালেটে নতুন লেয়ার যুক্ত করার জন্য-

- প্যালেটের নিচে Create a new layer আইকনে ক্লিক করলে বিদ্যমান লেয়ার বা সিলেক্ট করা লেয়ারটির উপরে একটি নতুন লেয়ার যুক্ত হবে। এ লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার। নতুন যুক্ত করা লেয়ারে কোনো অবজেক্ট তৈরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী সরিয়ে স্থাপন করা যাবে। এভাবে পাঁচটি লেয়ার তৈরি করলে ১ নম্বর লেয়ারের উপরে ২ নম্বর লেয়ার, ২ নম্বর লেয়ারের উপর ৩ নম্বর লেয়ার, ৩ নম্বর লেয়ারের উপর ৪ নম্বর লেয়ার বিন্যস্ত হবে। আরো লেয়ার যুক্ত করা হলে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হবে।
- প্রয়োজন হলে লেয়ারের স্তর বিন্যাস পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। ২ নম্বর লেয়ারে ক্লিক করে মাউসে চাপ রেখে উপরের দিকে ড্র্যাগ করে ৩ নম্বর লেয়ারের উপর ছেড়ে দিলে লেয়ারটি ৩ নম্বর এবং ৪ নম্বর লেয়ারের মাঝখানে স্থাপিত হবে। দুটি লেয়ারের মাঝখানের বিভাজন রেখা সিলেক্টেড হওয়ার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এভাবে স্থানান্তরিত করা যাবে না। ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার অন্য কোনো স্তরে স্থাপন করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডকে লেয়ারে পরিণত করে নিতে হবে।

লেয়ারে ছবি দৃশ্যমান করা ও অদৃশ্য করা

প্রতিটি লেয়ারের একেবারে বাম দিকে রয়েছে চোখের আইকন। এ আইকনকে বলা হয় লেয়ার ভিজিবিলিটি আইকন। চোখের আইকনটির উপর ক্লিক করলে চোখটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সেইসঙ্গে ওই লেয়ারের ছবিটিও পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। অদৃশ্য চোখের জায়গাটিতে আবার ক্লিক করলে চোখের আইকনটি দৃশ্যমান হবে এবং সেইসঙ্গে ওই লেয়ারের ছবিও পর্দায় দৃশ্যমান হবে। ফুলের ছবির লেয়ারকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য করে দেখা যেতে পারে।

থাম্বনেইল আইকন

- চোখ আইকনের ডান পাশের সারিতে রয়েছে থাম্বনেইল আইকন। থাম্বনেইলের অর্থ হচ্ছে বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ। পর্দার ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেয়ারে ওই ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রদর্শিত হয় এই থাম্বনেইল আইকনে। এতে কোন লেয়ারে কোন ছবি রয়েছে দেখে দেখে কাজ করতে সুবিধা হয়।

গুচ্ছ প্যালেট এবং প্যালেট যুক্ত ও বিযুক্ত করা

একই সঙ্গে একাধিক প্যালেট এক সাথে থাকতে পারে। যেমন- Layer, Path এবং Channel একই সঙ্গে থাকতে পারে। প্যালেটগুলোর নাম ট্যাব আকারে থাকবে। যখন যে ট্যাবে ক্লিক করা হবে তখন সেই প্যালেটটি সক্রিয় হবে। এভাবে একসঙ্গে একাধিক প্যালেটের যুক্ত অবস্থাকে বলা হয় গুচ্ছ প্যালেট।

- বর্তমানে প্যালেটটি Layer প্যালেট হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। Layer ট্যাবে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে প্যালেটের বাইরে এনে ছেড়ে দিলে Layer প্যালেটটি স্বতন্ত্র প্যালেট বা একক প্যালেট হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।
- আবার স্বতন্ত্র Layer প্যালেটটির ট্যাবে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অন্য প্যালেটের ভেতরে নিয়ে গেলে যখন প্যালেটের চারদিকে মোটা রেখা দৃশ্যমান হবে তখন মাউস থেকে চাপ ছেড়ে দিতে হবে। এতে ড্র্যাগ করে নেওয়া লেয়ারটি ওই গুচ্ছ প্যালেটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
- পর্দায় Layer প্যালেট বিদ্যমান না থাকলে Window মেনু থেকে Layers কমান্ড সিলেক্ট করলে পর্দায় লেয়ার প্যালেট পাওয়া যাবে।

লেয়ারে অবজেক্ট তৈরি করা

সিলেকশন তৈরি এবং রং দিয়ে পূরণ করার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে। এ পর্যায়ে আয়তকার সিলেকশন টুল এবং বৃত্তাকার সিলেকশন টুল দিয়ে খুব সাধারণ দুটি অবজেক্ট তৈরি করা এবং সেই সঙ্গে টেক্সট টুলের সাহায্যে লেখার পদ্ধতি শিখব।

ক. ১ নম্বর লেয়ারে আয়তকার অবজেক্ট তৈরি করা –

- New ডায়ালগ বক্সের Background Contents অপশন থেকে সাদা বা White সিলেক্ট করলে লেয়ার প্যালেটে ভিত্তি লেয়ার হিসেবে Background থাকবে। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের উপর একটি স্বচ্ছ লেয়ার তৈরি করে নেওয়ার জন্য-
- প্যালেটের নিচে Create a new layer আইকনে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা লেয়ারটির উপরে একটি নতুন লেয়ার যুক্ত হবে। এটি হবে ১ নম্বর লেয়ার এবং লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার।
- Layer ১ বা ১ নম্বর লেয়ারে চতুর্ভুজ মার্কি টুল বা Rectangular Marquee tool-এর সাহায্যে আয়তকার সিলেকশন তৈরি করতে হবে এবং সিলেকশনটি সবুজ রং দিয়ে পূরণ করতে হবে।
- তৈরি করা আয়তকার অবজেক্টটি মুভ টুলের সাহায্যে ক্যানভাসের যেকোনো স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

খ. ২ নম্বর লেয়ার যোগ করা এবং বৃত্তাকার অবজেক্ট তৈরি করা –

- ১ নম্বর লেয়ারের উপর ক্লিক করলে লেয়ারটি সিলেক্টেড হয়ে যাবে।
- প্যালেটের নিচে Create a new layer আইকনে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা লেয়ারটির উপরে একটি নতুন লেয়ার যুক্ত হবে। এটি হবে ২ নম্বর লেয়ার এবং লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার।

অথবা

- লেয়ার প্যালেটের ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে New Layer কমান্ড সিলেক্ট করলে New Layer ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে। ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে Layer-2 প্রদর্শিত হবে। Name ঘরে নতুন নাম হিসেবে Circle টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং লেয়ার প্যালেটে ১ নম্বর লেয়ারের উপরে Circle নামে নতুন লেয়ার যুক্ত হবে।
- এবার বৃত্তাকার মার্কি টুল দিয়ে এমনভাবে গোলাকার সিলেকশন তৈরি করতে হবে যেন বৃত্তের অর্ধেকটা সবুজ জমিনের উপরে এবং অর্ধেকটা বাইরে সাদা অংশে থাকে।
- সিলেকশনকে লাল রং দিয়ে ফিল বা পূরণ করতে হবে। এখন Circle লেয়ারের থাম্বনেইলে লাল বৃত্ত দেখা যাবে।

গ. টেক্সট লেয়ার তৈরি করা

- মনে রাখতে হবে, Type টুলের সাহায্যে টাইপের কাজ শুরু করলে ওই লেখা আপনাআপনি নতুন Text লেয়ারে তৈরি হবে। নতুন Text লেয়ারটি হবে স্বচ্ছ লেয়ার। Text লেয়ারে লেখার কাজ করার জন্য-

২০২৫

- টুল বক্স থেকে Type টুল সিলেক্ট করে ক্যানভাসের উপর ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে লেয়ার প্যালেটে নতুন লেয়ার যুক্ত হবে।
- Text টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার ক্যানভাসের উপর ক্লিক করলে লেখার ফন্ট, ফন্টের আকার ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য অপশন বার-এ প্রয়োজনীয় ড্রপ-ডাউন অপশন তালিকা পাওয়া যাবে।
- ফন্ট ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে সুতন্বী এমজে ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে।
- ফন্ট সাইজ ফন্ট ড্রপ- ডাউন তালিকা থেকে অক্ষরের আকার আপাতত ৭২ পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।
- ফন্টে রঙ আপাতত কালো রাখা যায়।
- এবার 'সোনার বাংলা' টাইপ করা হলো। লেখাটি নতুন লেয়ার হিসেবে যুক্ত হবে। লেয়ার প্যালেটে Text লেয়ারটি থাম্বনেইল হিসেবে T বর্ণ থাকবে।
- টাইপের কাজ শেষ করার পর মুভ টুল বা মাউস পয়েন্টারের সাহায্যে লেখাকে যেকোনো অবস্থানে সরিয়ে বসানো যাবে।
- এবার মুভ টুলের সাহায্যে চতুর্ভুজ, বৃত্ত এবং লেখা বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে স্থাপন করে দেখা যেতে পারে।
- অবজেক্ট তিনটির সমন্বিত অবস্থান সন্তোষজনক হলে ফাইলটি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য সেভ বা সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

এক ফাইলের ছবি অন্য ফাইলে স্থানান্তরিত করা

একসঙ্গে একাধিক ছবি নিয়ে কাজ করার জন্য একটি ফাইলে সবগুলো ছবি স্থানান্তরিত করে নিতে হয়। এ জন্য ধরা যাক, Default Photoshop Size -এর একটি শূন্য ফাইল তৈরি করা হলো। এরপর Banana নামের কলার ছবি বিশিষ্ট ফাইল খোলা হলো। এবার মুভ টুল দিয়ে কলার ছবির উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে শূন্য ফাইলের উইন্ডোর ভেতরে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এতে কলার ছবিটি কপি হয়ে শূন্য ফাইলে চলে যাবে। কলার ফাইলটি বন্ধ করে দিতে হবে।

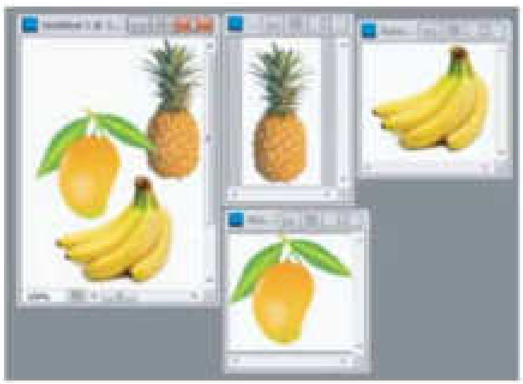

একই পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আম, আনারস ইত্যাদি আরও ছবি নতুন তৈরি করা ফাইলে স্থানান্তরিত করে নেওয়া যাবে।

টার্গেট লেয়ার নির্ধারণ করা

- যে লেয়ারের ছবি সম্পাদনার কাজ করা হয় সেই লেয়ারটিকে বলা হয় Target Layer.
- যে কোনো সময় যেকোনো লেয়ারের ছবি সম্পাদনার কাজ করা যায় তবে একসঙ্গে একটিমাত্র লেয়ারের ছবিই সম্পাদনা করা যায়।

কোনো লেয়ারকে টার্গেট লেয়ারে পরিণত করার জন্য–

- লেয়ারটির উপর মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলেই ঐ লেয়ারটি টার্গেট লেয়ারে পরিণত হয়। লেয়ারটিকে তখন সিলেক্টেড দেখা যায়।

লেয়ারের ওপাসিটি পরিবর্তন করা

- Opacity হচ্ছে রঙের গাঢ়ত্ব। লেয়ার প্যালেটের উপরের ডান দিকে Opacity টেক্সট বক্সে ১০০% বিদ্যমান থাকে। Opacity লেখার উপরে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে মাউস পয়েন্টার দ্বিমুখী তীরে পরিণত হবে। দ্বিমুখী তীরটি বাম দিকে ড্র্যাগ করলে Opacity বা রঙের গাঢ়ত্ব কমবে এবং ডানে সরিয়ে নিলে Opacity বা রঙের গাঢ়ত্ব বাড়বে।
- এ ছাড়া, Opacity টেক্সট বক্সে সরাসরি পরিমাণসূচক সংখ্যা টাইপ করেও Opacity কম-বেশি করা যায়।

লেয়ার বাতিল করে দেওয়া

যে লেয়ারটি বাতিল করতে হবে বা ফেলে দিতে হবে সেই লেয়ারটি অবশ্যই সিলেক্ট করতে হবে। এরপর-

- লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে Delete Layer কমান্ড দিতে হবে।

অথবা

- লেয়ারটি সিলেক্ট করে প্যালেটের নিচের সারিতে Delete Layer আইকনে ক্লিক করলে একটি জিজ্ঞাসাসূচক ডায়ালগ বক্স আসবে 'আপনি ঐ লেয়ারটি মুছে ফেলতে চান কি-না?' হ্যাঁ বা Yes বোতামে ক্লিক করলে লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে। 'না' বা No বোতামে ক্লিক করলে বাতিল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

একাধিক লেয়ার একীভূত করা

ফটোশপে কাজ করার জন্য অনেক সময় অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজ শেষ করার পর অন্য কোনো কম্পিউটারে বা প্রিন্টিং মেশিনে প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজন হলে সম্পাদিত কাজটি সিডি বা পেন ড্রাইভে কপি করে নিতে হয়। এ জন্য ফাইলের আকার ছোটো রাখার চেষ্টা করা হয়। লেয়ারগুলো একীভূত করে নিলে ফাইলের আকার অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়।

একাধিক লেয়ার একীভূত করার জন্য-

- লেয়ারস প্যালেটের পপ-আপ মেনুতে Merge Visible, Flatten Image এবং Merge Down নামে তিনটি কমান্ড রয়েছে।
- কোনো লেয়ার যদি অদৃশ্য থাকে তাহলে Merge Visible কমান্ড দিলে শুধু দৃশ্যমান লেয়ারগুলো একীভূত হবে। অদৃশ্য লেয়ারটি একীভূত হবে না।
- Merge Down কমান্ড দিলে সিলেক্ট করা লেয়ার এবং ঠিক তার নিচের লেয়ার একীভূত হবে।
- Flatten Image কমান্ড দিলে সবগুলো লেয়ার একীভূত হয়ে যাবে।
- কোনো লেয়ার অদৃশ্য থাকলে ওই লেয়ারটি বাতিল করা হবে কি-না, এ মর্মে জিজ্ঞাসাসূচক বার্তা আসবে। Yes বোতামে ক্লিক করলে অদৃশ্য লেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং দৃশ্যমান লেয়ারগুলো একীভূত হয়ে যাবে।

কাট, কপি, পেস্ট ও পেস্ট ইনটু

কোনো অবজেক্ট বা ইমেজ সম্পূর্ণভাবে সিলেক্ট করে বা নির্দিষ্ট কোনো অংশ সিলেক্ট করে কাট, কপি ও পেস্ট কমান্ড কার্যকর করতে হয়।

কাট বা কপি করা কোনো বিষয় পেস্ট করলে আপনাআপনি নতুন লেয়ার তৈরি হয় এবং পেস্ট করা অবজেক্ট নতুন লেয়ারে পেস্ট হয়। তবে, পেস্ট করার আগেই যদি স্বচ্ছ লেয়ার তৈরি করে নেওয়া হয়, তাহলে কাট বা কপি করা কোনো বিষয় ওই লেয়ারেই পেস্ট হয়।

ক্রপ টুলের ব্যবহার

বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ছবির বর্ডার বা প্রান্ত নিখুঁত এবং মসৃণ নাও হতে পারে। প্রান্তভাগ থেকে কিছুটা অংশ ছেঁটে ফেলার প্রয়োজন হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

এ ছাড়া, ছবিটি সমান্তরাল না হয়ে, যেকোনো দিক বাঁকা হয়ে থাকতে পারে বা হেলে থাকতে পারে।

ছবি সম্পাদনার শুরুতে এ ধরনের সমস্যা বা ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে। ছবি ছেঁটে ফেলার কাজ করতে হয় Crop টুলের সাহায্যে। Crop শব্দের অর্থ হচ্ছে ছেঁটে ফেলা।

- পুরোনো এই ছবিটির চারদিকের প্রান্ত বা বর্ডার এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ছবি সম্পাদনার প্রথম কাজটিই হবে এর এবড়োখেবড়ো প্রান্ত বা বর্ডার ছেঁটে ফেলা। এ জন্য-
- টুল বক্স থেকে Crop Tool সিলেক্ট করতে হবে।
- আয়তকার মার্কি টুলের মতো ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ছবির এবড়োখেবড়ো প্রান্ত বা বর্ডার অংশটুকু বাইরে রেখে ভেতরের প্রয়োজনীয় অংশ সিলেক্ট করতে হবে।
- সিলেকশনের চার বাহুতে চারটি এবং চার কোণে চারটি মোট আটটি ফাঁপা চতুষ্কোণ বক্স দেখা যাবে। এই চতুষ্কোণ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে সিলেকশনের এলাকা বাড়ানো-কমানো যাবে।
- সিলেকশন এলাকা চূড়ান্ত করার পর কীবোর্ডের Enter বোতামে চাপ দিলে সিলেকশনের বাইরের অংশটুকু বাদ পড়ে যাবে।
- সিলেক্ট করার পর যদি মনে হয় ক্রপ করার কাজ থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন, তাহলে কীবোর্ডের Esc বোতামে চাপ দিলে সিলেকশন চলে যাবে। প্রয়োজন হলে আবার নতুন করে সিলেক্ট করা যাবে।

হেলানো ছবি ক্রপ করা

- কোনো হেলানো ছবি ক্রপ করার ক্ষেত্রে ছবিটি ফটোশপে প্রদর্শিত অবস্থায় ফাইল মেনু থেকে Automate কমান্ডের সাব-মেনু থেকে Crop and Straighten Photos কমান্ড সিলেক্ট করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছবিটি ক্রপ হয়ে সোজাভাবে স্থাপিত হবে। এ পদ্ধতি শুধু এক রঙের সলিড ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যাকগ্রাউন্ড একাধিক রংবিশিষ্ট হলে এ পদ্ধতিতে ক্রপিংয়ের কাজ করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে-

- ক্রপ টুল দিয়ে সিলেক্ট করতে হবে।
- সিলেকশনের হ্যান্ডেলগুলোর যেকোনো কোণে মাউস পয়েন্টার বাঁকানো পয়েন্টারে বা রোটেট টুলে পরিণত হবে। এ টুলের সাহায্যে সিলেকশনকে ঘুরিয়ে ছবির হেলানো অবস্থার সঙ্গে স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য হ্যান্ডেলের সাহায্যে ক্রপিংয়ের এলাকা চূড়ান্ত করতে হবে।
- কীবোর্ডের Enter বোতামে চাপ দিলে ছবিটির ছাঁটাই করার কাজ সম্পন্ন হবে এবং ছবিটি সোজাভাবে স্থাপিত হবে।

ইরেজার টুল-এর ব্যবহার

- ইরেজার টুল দিয়ে যখন কোন রং মুছে ফেলা হয় তখন ঐ রংটি আসলে ক্যানভাসের রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ক্যানভাসের রং সাদা হলে মনে হবে রংটা মুছে যাচ্ছে। ক্যানভাসের রং সাদা ছাড়া অন্য কোনো রং হলে বিষয়টি বোঝা যাবে। তবে, স্বচ্ছ (transparent) লেয়ারের ছবি ইরেজার টুল দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে মুছে ফেলা যাবে।
- সূক্ষ্ম অংশ মোছার জন্য কীবোর্ডের CAPS LOCK চেপে দিলে ইরেজার টুল যোগ চিহ্নের (+) আকার ধারণ করে। তখন সূক্ষ্ম অংশে মোছার কাজ করা যায়।
- ইরেজার টুলের অপশন বার-এর মোড ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে ব্রাশ, পেনসিল বা বক সিলেক্ট করে মোছার কাজ করা যায়। বক সিলেক্ট করলে রাবার ইরেজার ইলেক্ট্রনিক সংস্করণের মতো কাজ করে। অন্য টুলগুলো সিলেক্ট করলে ওই সব টুলের Opacity অপশন ব্যবহার করা যায়।

গ্রেডিয়েন্ট টুলের সাহায্যে ব্লেন্ড তৈরি করা

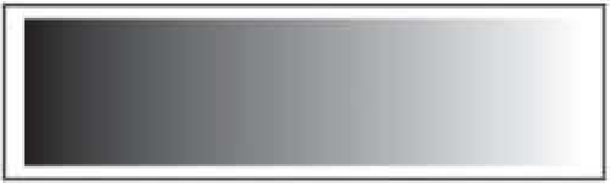

Gradient Tool-এর একই অবস্থানে পেইন্ট বাকেট টুল রয়েছে। গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলে অপশন বার-এ ৫ প্রকার গ্রেডিয়েন্ট তৈরির আইকন পাওয়া যাবে। যেমন- Linear Gradient, Radial Gradient, Angle Gradient, Reflected Gradient এবং Diamond Gradient.

একটি রং শুরু থেকে শেষের দিকে ক্রমে মিলিয়ে যাওয়াকেই ব্লেন্ড বলা হয়। লিনিয়ার ব্লেন্ডে রং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, রেডিয়াল ব্লেন্ডে রং শুরুর স্থান থেকে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায় বা চতুর্দিকের গাঢ় রং কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে হতে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায়।

গ্রেডিয়েন্ট টুলের সাহায্যে লিনিয়ার ব্লেন্ড তৈরি করার জন্য-

- আয়তকার মার্কি টুলের সাহায্যে তিন ইঞ্চি প্রস্থ ও দুই ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সিলেকশন তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।
- গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে মাউস ক্যানভাসে নিয়ে এলে যোগ চিহ্নে পরিণত হবে। যোগচিহ্ন পয়েন্টারটি সিলেকশনের বাম প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থানে ক্লিক করে ডান প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পর মাউস পয়েন্টার থেকে আঙুলের চাপ তুলে নিতে হবে। দেখা যাবে সিলেকশনটি কালো রং থেকে শুরু হয়ে শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে গেছে।

- ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে, উপর নিচে এবং নিচ থেকে উপরের দিকে এবং কোনাকুনি টেনেও বেন্ড তৈরি করা যায়। পর্দায় কোনো কিছু সিলেক্ট করা না থাকলে সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে বেন্ড তৈরি হয়ে যাবে।
- রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করার জন্য অপশন বার-এ রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট আইকনে ক্লিক করে সক্রিয় করে নিতে হবে।
- মাউস ক্যানভাসে নিয়ে এলে যোগ চিহ্নে পরিণত হবে। যোগ চিহ্ন পয়েন্টারটি সিলেকশনের মাঝামাঝি অবস্থানে ক্লিক করে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পর মাউস পয়েন্টার থেকে আঙুলের চাপ তুলে নিতে হবে।

গ্রেডিয়েন্ট সম্পাদনা

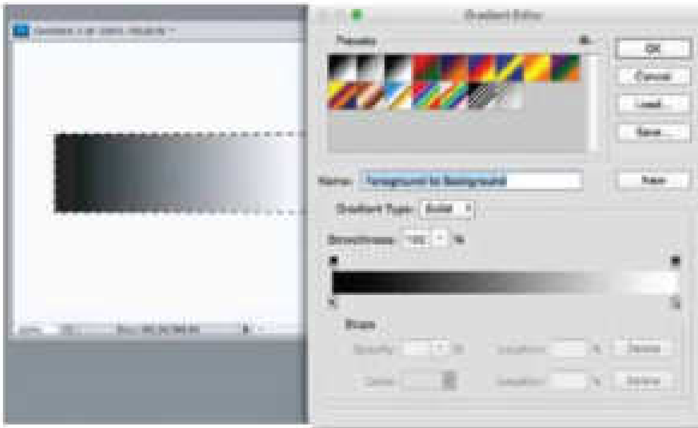

Gradient Editor ডায়ালগ বক্সে শুরু, শেষ এবং মধ্যবর্তী রং পরিবর্তন/সমন্বয় করে গ্রেডিয়েন্ট সম্পাদনার কাজ করতে হয়। এ জন্য-

- গ্রেডিয়েন্ট বার-এ ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট এডিটর ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- গ্রেডিয়েন্ট এডিটর ডায়ালগ বক্সের গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের বাম প্রান্তে নিচে এবং ডান প্রান্তের নিচে Color Stop ত্রিকোণ এবং বাম প্রান্তের উপরে ও ডান প্রান্তের উপরে রয়েছে Opacity Stop ত্রিকোণ। ধরা যাক, একটি লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টের শুরুর রং হচ্ছে লাল এবং শেষের রং হচ্ছে হলুদ। এ ক্ষেত্রে লাল রঙের পরিবর্তে নীল রং ব্যবহার করার জন্য-
- গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের বাম প্রান্তের Color Stop ত্রিকোণে ক্লিক করলে নিচে Stops এলাকায় Color সোয়াচ সক্রিয় হবে। কালার সোয়াচে ক্লিক করলে Select stop color ডায়লগ বক্স আসবে। এ ডায়লগ বক্সে নীল রং সিলেক্ট করে OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্স চলে যাবে এবং গ্রেডিয়েন্ট বার-এর বাম প্রান্তের স্টপ কালার বা রং হিসেবে নীল যুক্ত হবে। এবার, গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ড্র্যাগ করলে নীল এবং হলুদ রঙের সমন্বয়ে গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হবে।
- কালার স্টপ সিলেক্ট করলে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের নিচের দিকে এবং ওপাসিটি স্টপ সিলেক্ট করলে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারের উপরের দিকে মাঝখানে একটি ডায়মন্ড আকৃতির আইকন দেখা যাবে। এই আইকনটি গ্রেডিয়েন্টের মধ্যবিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে। মধ্যবিন্দু থেকে রং মিলিয়ে যাওয়া শুরু হয়। মধ্যবিন্দু আইকন সিলেক্ট করার পর অবস্থান বা লোকেশন ঘরে অবস্থানের স্থান-নির্ধারণীসূচক সংখ্যা টাইপ করে মধ্যবিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। আইকনটি ডানে-বাঁয়ে ড্র্যাগ করেও মধ্যবিন্দুর অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।

নতুন রঙ ও কালার স্টপস যুক্ত করা ও বাতিল করা

গ্রেডিয়েন্টের জন্য দুটির বেশি রং ব্যবহার করতে হলে স্লাইডারে নতুন কালার স্টপ যোগ করতে হবে। এ জন্য –

- স্লাইডারের নিচে যেকোনো জায়গায় ক্লিক করলে পাশের কালারের সঙ্গে রং মিশ্রণের মধ্যবিন্দু নির্ধারক ডায়মন্ডসহ ক্লিক করা অবস্থানে নতুন কালার স্টপ যুক্ত হবে। একই নিয়মে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কালার স্টপ যোগ করা যাবে।
- অতিরিক্ত কালার স্টপ বাতিল করা বা ফেলে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কালার স্টপ আইকনে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে স্লাইডারের বাইরে এনে ছেড়ে দিলে কালার স্টপটি বাতিল হয়ে যাবে।

ছবির ঔজ্জ্বল্য ও কন্ট্রাস্ট সমন্বয় করা

স্ক্যান করা ছবি অথবা ক্যামেরায় তোলা ছবি অনুজ্জ্বল হতে পারে। সাদা-কালো বা রঙের দৃশ্যমানতা আশানুরূপ নাও হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ছবির ঔজ্জ্বল্য শাণিত করা এবং কনট্রাস্ট সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। ছবির ঔজ্জ্বল্য বা কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্য-

- Image মেনুর Adjustments কমান্ড সিলেক্ট করে প্রাপ্ত সাব-মেনু থেকে Brightness/Contrast সিলেক্ট করলে সংশ্লিষ্ট ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।
- ডায়লগ বক্সের ব্রাইটনেস/কনট্রাস্ট স্লাইডারের ত্রিকোণ ডানে/বাঁয়ে সরিয়ে ছবির ঔজ্জ্বল্য এবং কন্ট্রাস্ট বাড়ানো/ কমানোর কাজ করতে হবে।
- ডায়লগ বক্সে আসার আগে ছবির কোনো অংশ সিলেক্ট করে নিলে শুধু ওই অংশের ঔজ্জ্বল্য এবং কনট্রাস্ট বাড়ানো/ কমানোর কাজ করা যাবে।

ডায়ালগ বক্সের Preview চেক বক্সে ক্লিক করে সক্রিয় করে রাখলে ছবির রং পরিবর্তনের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করা যাবে। পরিবর্তিত রূপ সন্তোষজনক মনে না হলে কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রাখলে ডায়ালগ বক্সের Cancel বোতামটি Reset বোতামে পরিণত হবে। Alt বোতাম চেপে রাখা অবস্থাতেই Reset বোতামে ক্লিক করলে এ-যাবৎ করা কাজ বাতিল হয়ে যাবে। এ নিয়ম Adjustments কমান্ডের মেনুর অধীন সবগুলো ডায়ালগ বক্সের জন্যই প্রযোজ্য।

ইলাস্ট্রেটর

এডোবি ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে মূলত ছবি আঁকা, নকশা প্রণয়ন করা, লোগো তৈরি করা এবং অন্যান্য ডিজাইন তৈরি করার প্রোগ্রাম। এডোবি ফটোশপ প্রোগ্রামের সাহায্যে যেমন ডিজাইনের কাজ করার সুযোগ খুবই সীমিত, তেমনি এডোবি ইলাস্ট্রেটরে ছবি সম্পাদনার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। ইলাস্ট্রেটরের প্রধান কাজই হচ্ছে অঙ্কন শিল্পের কাজ।

২০২৫

আমাদের দেশে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশনার প্রচ্ছদ তৈরি করার জন্য শিল্পীরা এখন রং তুলির ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন বললেই চলে। এডোবি ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করেই এখন তাঁরা প্রচ্ছদ তৈরির কাজ করে থাকেন। আমন্ত্রণপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছোটো-বড়ো কাজসহ বিভিন্ন আকারের পোস্টার, বিশাল আকারের ব্যানার, বিলবোর্ড ইত্যাদি তৈরির কাজ এখন ইলাস্ট্রেটর ছাড়া ভাবাই যায় না।

কম্পিউটার ব্যবহার করে ডিজাইনের কাজ করার জন্য আরও অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে। কিন্তু কাজের সুবিধা এবং বৈচিত্র্যের জন্য ইলাস্ট্রেটরের চাহিদা বেশি। এসব কারণে, ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়।

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামে ইংরেজি ও বাংলা লেখালেখির জন্য কম্পিউটারের কীবোর্ড ব্যবহার করা ছাড়াও শিল্পীর তুলি দিয়ে লেখার মতো করেও লেখালেখির কাজ করা যায়। লেখার পরে অক্ষর বা অক্ষরসমূহের আকার এবং আকৃতি যেভাবে ইচ্ছা বা প্রয়োজন সে ভাবেই পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।

অন্যান্য প্রোগ্রামের মতোই ইলাস্ট্রেটরে কাজ করার জন্য ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামটি খুলে নিতে হয় এবং নতুন ফাইল তৈরি করে কাজ শুরু করতে হয়।

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলা

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলার জন্য-

১. পর্দার নিচের দিকে বাম কোণে স্টার্ট (Start) বোতামের উপর মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু বা তালিকা আসবে।

২. এ মেনুর অল প্রোগ্রামস (All Programs) কমান্ডের উপর মাউস পয়েন্টার স্থাপন করলে একটি ফ্লাইআউট মেনু পাওয়া যাবে।

৩. এ ফ্লাইআউট মেনু তালিকা থেকে এডোবি মাস্টার কালেকশন (Adobe Master Collection) মেনুতে ক্লিক করলে আর একটি ফ্লাইআউট মেনু আসবে। এ মেনুতে এডোবির প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে।

৪. এ তালিকা থেকে এডোবি ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রামের নামের উপর ক্লিক করলে এডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator) প্রোগ্রাম খুলে যাবে।

ইলাস্ট্রেটরে নতুন ফাইল খোলার জন্য-

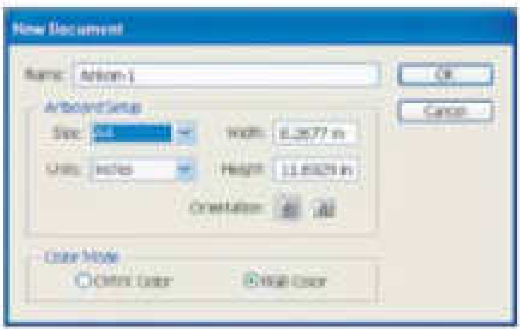

- File মেনু থেকে New কমান্ড দিলে অথবা কীবোর্ডের Ctrl বোতাম চেপে রেখে N বোতামে চাপ দিলে New ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে। New ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে ফাইলের জন্য একটি নাম টাইপ করতে হবে, ধরা যাক, Ankon-1. এ ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। যে ধরনের নাম মনে রাখতে সুবিধা হয় বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে ধরনের যেকোনো নাম রাখা যেতে পারে। এতে পরবর্তী পর্যায়ে ফাইলটি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

- Size ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিস্তৃত ড্রপ-ডাউন তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকায় কাগজের বিভিন্ন মাপসূচক পরিচিতি পাওয়া যাবে। এর ভেতর থেকে যে মাপের কাগজে কাজ করা প্রয়োজন সেই মাপের নামে সিলেক্ট করলে দৈর্ঘ্য (Height) ও প্রস্থ (Width) ঘরে ওই কাগজের প্রকৃত মাপ দেখা যাবে।

- Units ঘরে বিভিন্ন মাপের একক রয়েছে। আমাদের দেশের ব্যবহারকারীরা ইঞ্চির (Inches) মাপে কাজ করে অভ্যস্ত। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম মাপে কাজ করার জন্য পয়েন্ট (Points), পাইকা (Picas), মিলিমিটার (Millimeters), সেন্টিমিটার (Centimeters), পিক্সেল (Pixel) ইত্যাদি মাপ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। ইউনিট (Units) ঘরের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করলে বিস্তৃত ড্রপ-ডাউন তালিকা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী মাপের একক নির্ধারণ করে নিতে হবে।
- Orientation-এর ডান দিকে দুটি মানুষের চিত্র রয়েছে। প্রথমটিতে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে কাগজ খাড়াখাড়ি (Portrait) অবস্থায় থাকবে। দ্বিতীয়টিতে ক্লিক করে সক্রিয় করে দিলে কাগজ আড়াআড়ি (Landscape) অবস্থায় থাকবে।
- Color Mode অংশে RGB এবং CMYK নামে দুটি অপশন পাওয়া যাবে। মুদ্রণের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য CMYK মোডে কাজ করাই ভালো। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য RGB মোড ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের পর্দায় এ দুটি মোডের পার্থক্য অবশ্য তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না।
- এ সব মাপজোক ঠিক করে ডায়লগ বক্সের OK বোতামে ক্লিক করলে ডায়ালগ বক্সটি চলে যাবে এবং কাজ করার জন্য নতুন একটি উইন্ডো পাওয়া যাবে।

New ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে ফাইলের জন্য কোনো নাম টাইপ করা হলে মেনু বার-এর উপরে টাইটেল বার-এ এডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator)-এর ডান দিকে ওই নাম দেখা যাবে। New ডায়ালগ বক্সের Name ঘরে কোনো নাম টাইপ করা না হলে টাইটেল বার-এ এডোবি ইলাস্ট্রেটর (Adobe Illustrator)-এর ডান দিকে আনটাইটেলড (Untitled.........) লেখা থাকবে।

কাজের পরিবেশ পরিচিতি

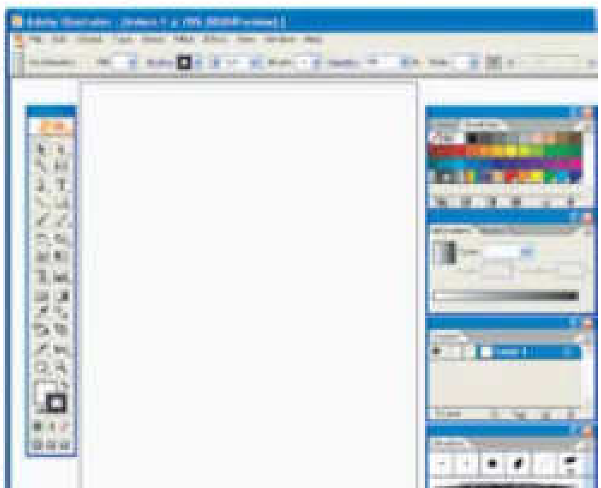

নতুন ফাইল তৈরির করার পর পর্দায় নতুন শূন্য ফাইল পাওয়া যাবে। ফাইল খোলার পর কাজ শুরু করার জন্য পর্দায় বিভিন্ন প্রকার উপকরণ বিদ্যমান থাকে। যেমন- মেনু বার, টুলবক্স, ভাসমান প্যালেট (Floating Palette) স্ক্রলবার ইত্যাদি।

টাইটেল বার

ইলাস্ট্রেটর প্রোগ্রাম খোলার পর পর্দার একেবারে উপরে বাম পাশে টাইটেল বার-এ অ্যাপ্লিকেশনের নামের সঙ্গে ডকুমেন্টের অন্যান্য তথ্য থাকতে পারে এ রকম– Adobe Illustrator-[Ankon-1 @ 70 (RGB/Preview)]। এখানে Adobe Illustrator হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের নাম, Ankon-1 হচ্ছে ফাইলের নাম, যদি ফাইল তৈরির সময় দেওয়া হয়, @ 70 (CMYK/Preview) হচ্ছে পর্দার দৃশ্যমান এলাকার আকার এবং ব্যবহৃত কালার মোডের পরিচিতি। এই লেখাগুলোর বরাবর ডান দিকে চলে যাওয়া পুরো অংশটি হচ্ছে টাইটেল বার।

- নতুন ফাইল খোলার সময় কোনো নাম ব্যবহার করা না হলে পরবর্তীতে অন্য কোনো নাম দিয়ে ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। ফাইলগুলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করার পর যখন যে নামের ফাইল নিয়ে কাজ করা হয় তখন সেই ফাইলটির নাম টাইটেল বার-এ অ্যাপ্লিকেশনের নামের ডান দিকে প্রদর্শিত হয়।

Toolbox & Palette-এ থাকে ডিজাইন-ড্রয়িংয়ের বিভিন্ন প্রকার টুল ও অপশন। এসব টুল ও অপশন ব্যবহার ও প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার ডিজাইন ড্রয়িংয়ের কাজ করা হয় এবং কাজকে প্রত্যাশিত রূপ দেওয়ার জন্য নানা রকম সম্পাদনার কাজ করতে হয়।

টুলবক্সের প্রয়োজনীয় টুলসমূহের পরিচিতি

কাজের শুরুতে টুলবক্সের প্রয়োজনীয় কিছু টুলের নাম জেনে নেওয়া যেতে পারে।

টুলবক্সে এলিপস, পলিগোন, স্টার এবং স্পাইরাল টুলগুলো একই অবস্থানে থাকে। এ রকম একই অবস্থানে একাধিক টুলের অবস্থানকে বলা হয় গ্রুপ টুল। এ সব টুলের সঙ্গে ডানমুখী ত্রিকোণ রয়েছে। টুলের সঙ্গে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে একই অবস্থানে আরও টুল রয়েছে। টুলবক্সে দৃশ্যমান টুলটিতে ক্লিক করে মাউস চেপে রাখলে সবগুলো টুল একসঙ্গে দেখা যায়। যে টুলটি ব্যবহার করা প্রয়োজন মাউস পয়েন্টার ড্র্যাগ করে সেই টুলটিতে ক্লিক করলে ওই টুলটি টুল বক্সে দৃশ্যমান থাকে।

টুলবক্সের টুলগুলোর নিচের সোয়াচে (Swatch) কয়েকটি আইকন রয়েছে। এ আইকনগুলোর সাহায্যে অবজেক্ট এবং অবজেক্টের প্রান্তে রং প্রয়োগ করা হয়, রং বাতিল করে দেওয়া হয়। আইকনগুলোর ব্যবহার বোঝার সুবিধার্থে একটি অবজেক্ট তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। এরূপ একটি অবজেক্ট তৈরির জন্য–

- মাউস পয়েন্টার দিয়ে রেক্টেঙ্গেল টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সিলেক্টেড হবে।
- মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে এনে যেকোনো জায়গায় ক্লিক করে নিচের দিকে ডান কোনাকুনি এক ইঞ্চির মতো ড্র্যাগ করার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিলে একটি আয়তাকার বা চতুর্ভুজ অবজেক্ট তৈরি হবে।
- অবজেক্টটি সিলেক্টেড থাকবে এবং কোনো একটি রঙ দ্বারা পূরণ (fill) করা অবস্থায় থাকতে পারে।
- সিলেক্টেড অবজেক্টের চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র ফাঁপা বক্স থাকবে। এ অবস্থায় চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র ভরাট বক্স দৃশ্যমান হবে।

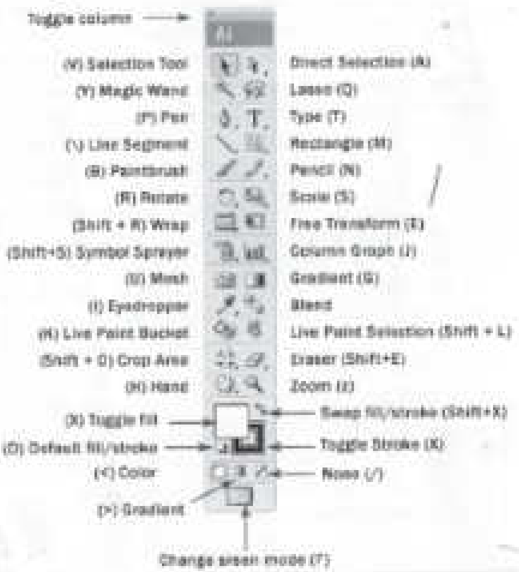

- কোনো কারণে অবজেক্টটি সিলেকশনমুক্ত হয়ে গেলে মাউস পয়েন্টার দিয়ে টুলবক্সে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট হবে। এবার মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে এনে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে অবজেক্টটি সিলেক্টেড হবে। এ অবস্থায় আবার সিলেকশন টুলে ক্লিক করলে চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র ভরাট বক্সসহ চার বাহুতে আরও চারটি ক্ষুদ্র ভরাট বক্স দৃশ্যমান হবে।

অবজেক্টে রং প্রয়োগ করা

ফিল ও স্ট্রোক

- একটি অবজেক্টের প্রান্ত বা বর্ডারকে বলা হয় স্ট্রোক এবং ভেতরের অংশকে বলা হয় ফিল। ফিল ও স্ট্রোক সোয়াচের ব্যবহার কালার প্যালেটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কালার প্যালেটটি পর্দায় বিদ্যমান না থাকলে উইন্ডো (Window) মেনু থেকে কালার (Color) কমান্ড দিলে বা কীবোর্ডের F6 বোতামে চাপ দিলে কালার প্যালেটটি পর্দায় উপস্থাপিত হবে। ফিল সোয়াচে ক্লিক করলে ফিল সোয়াচটি সক্রিয় হবে এবং উপরে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় শুধু ফিল (Fill)-এর কাজ করা যাবে। কোনো অবজেক্টকে রং দিয়ে পূরণ করা যাবে। স্ট্রোকে রং প্রয়োগ করা যাবে না। একই রকমভাবে স্ট্রোক সোয়াচে ক্লিক করলে স্ট্রোক সোয়াচটি সক্রিয় হবে এবং ফিল সোয়াচ উপরে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় অবজেক্টের স্ট্রোকে রং প্রয়োগ করা যাবে। অবজেক্টকে রং দিয়ে পূরণ করা বা ফিল (Fill)-এর কাজ করা যাবে না।
- ফিল (Fill) সোয়াচটি সক্রিয় থাকা অবস্থায় কালার প্যালেটের কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে সিলেক্টেড অবজেক্টটির ভেতরের অংশে সেই রঙে পূরণ হয়ে যাবে। আবার স্ট্রোক (Stroke) সোয়াচটিতে ক্লিক করে সক্রিয় করার পর কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে অবজেক্টের স্ট্রোক বা প্রান্তরেখা সেই রঙে পূরণ হয়ে যাবে। এতে অবজেক্টের ভেতরের রং পরিবর্তিত হবে না।
- স্ট্রোকের রং স্পষ্টভাবে দেখা বা বোঝার জন্য স্ট্রোককে মোটা করে নেওয়া যেতে পারে। এ জন্য উইন্ডো (Window) মেনু থেকে স্ট্রোক (Stroke) কমান্ড সিলেক্ট করলে পর্দায় স্ট্রোক প্যালেট উপস্থাপিত হবে। স্ট্রোক প্যালেটের ওয়েট ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে আপাতত কমপক্ষে ১০ সিলেক্ট করতে হবে। এতে অবজেক্টের বর্ডার বা স্ট্রোক আগের চেয়ে মোটা হবে। এ পর্যায়ে রং প্রয়োগ ও পরিবর্তন করলে স্পষ্ট দেখা যাবে বা বোঝা যাবে।

কালার, গ্রেডিয়েন্ট ও নান [Color (,) Gradient (.) None (/)]

ফিল ও স্ট্রোক সোয়াচের নিচের সারির ৩টি আইকন হচ্ছে যথাক্রমে কালার, গ্রেডিয়েন্ট ও নান। কালার আইকন ক্লিক করলে রঙের প্যালেট এবং গ্রেডিয়েন্ট আইকন ক্লিক করলে গ্রেডিয়েন্ট প্যালেট সক্রিয় হয়। নান আইকন ক্লিক করলে সিলেক্টেড অবজেক্টের ফিল বা স্ট্রোকের রং নিষ্ক্রিয় বা বাতিল হয়ে যায়। অবজেক্টটি কোনো রং বা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে পূরণ করা হয়ে থাকলে প্যালেটে সেই রংও প্রদর্শিত হবে। অবজেক্টটি সিলেক্টেড থাকলে অবজেক্টের রংও পরিবর্তিত হবে।

অবজেক্ট ছোটো/বড়ো করে দেখা

অবজেক্ট তৈরির জন্য অনেক সময় অনেক সূক্ষ্ম কাজ করতে হয়। অবজেক্টের স্বাভাবিক মাপে বা অবস্থায় সূক্ষ্ম কাজ করতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য অবজেক্টের নির্দিষ্ট একটি অংশকে বড়ো করে দেখা গেলে কাজের সুবিধা হয়। ইলাস্ট্রেটরে কাজ করার সময় পৃষ্ঠা বড়ো করে দেখাকে বলা হয় জুম ইন (Zoom In) এবং পৃষ্ঠা ছোটো করে দেখাকে বলা হয় জুম আউট (Zoom Out)। পৃষ্ঠা ছোটো/বড়ো করার সঙ্গে সঙ্গে অবজেক্টও ছোটো/বড়ো দেখা যায়।

অবজেক্ট ছোটো-বড়ো করে দেখার জন্য জুম টুল (Zoom Tool)-এর সাহায্যে পৃষ্ঠার দৃশ্যমান রূপ ছোটো/বড়ো করে দেখতে হবে। এ জন্য –

- টুলবক্সে জুম টুলে ক্লিক করলে জুম টুলটি সিলেক্টেড হবে।
- জুম টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার পর্দার উপরে নিয়ে এলে মাউস পয়েন্টার আতশি কাঁচের মতো দেখাবে এবং কাঁচের ভেতরে একটি যোগ চিহ্ন থাকবে।
- জুম টুল দিয়ে পর্দার উপর ক্লিক করলে পর্দার আকার বড়ো হবে। পর্দার আকার বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবজেক্টও বেশি বড়ো না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত রূপে পর্দার মধ্যেই অবস্থান করবে। বেশি বড়ো হয়ে গেলে অবজেক্টের কোনো অংশ নাও দেখা যেতে পারে। এ অবস্থায় হ্যান্ড টুলের সাহায্যে পর্দার উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ওই অংশ পর্দার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।
- জুম টুল সক্রিয় থাকা অবস্থায় কীবোর্ডের অল্টার Alt বোতামে চাপ দিলে জুম টুলটি জুম আউট (Zoom Out) টুলে পরিণত হবে। কীবোর্ডের অল্টার Alt বোতামে চেপে রেখে জুম আউট (Zoom Out) টুল দিয়ে ক্লিক করতে থাকলে পর্দার আকার ছোটো হয়ে আসতে থাকবে।
- কীবোর্ডের কন্ট্রোল Ctrl বোতাম চেপে রেখে হাইফেন (-) বোতামে চাপ দিলে জুম আউট এবং সমান-(=) চিহ্নের বোতামে চাপ দিলে জুম ইন-এর কাজ সম্পন্ন হবে।

হ্যান্ড টুলের সাহায্যে পৃষ্ঠা/অবজেক্টের অবস্থান পরিবর্তন

পৃষ্ঠার দৃশ্যমান রূপ ছোটো-বড়ো করা হলে অবজেক্টের প্রয়োজনীয় কোনো অংশ দৃশ্যযোগ্য এলাকার বাইরে চলে যেতে পারে। এমতাবস্থায় অবজেক্টটি পর্দার যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে স্থাপন করার জন্য –

- টুল বক্সের হ্যান্ড টুলে ক্লিক করে হ্যান্ড টুল সিলেক্ট করতে হবে।
- হ্যান্ড টুলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অবজেক্টের উপর ক্লিক ও ড্র্যাগ করে সুবিধাজনক স্থানে নেওয়ার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

এতে আসলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার অবস্থানই পরিবর্তিত হবে। ক্লিক করা অবজেক্টটি ভিন্নভাবে স্থানান্তরিত হবে না।

অবজেক্ট অবলোকনের পরিবেশ

ইলাস্ট্রেটরে অবজেক্ট অবলোকনের কয়েকটি মোড রয়েছে। View মেনু থেকে এর যেকোনো একটি প্রয়োজন অনুযায়ী সিলেক্ট করতে হবে।

- Outline মোডে বা পরিবেশে অবজেক্টকে শুধু আউটলাইন বা রেখা কাঠামো হিসেবে দেখা যায়। এ

পরিবেশে অবজেক্টের আকার-আকৃতি বা কাঠামো সম্পাদনার কাজ, বিশেষ করে রেখা বা পাথ সম্পাদনার সূক্ষ্ম কাজ করতে সুবিধা হয়।

- Pixel Preview বা Preview মোডে বা পরিবেশে অবজেক্ট প্রকৃতরূপে প্রদর্শিত হয়।
- Overprint Preview মোডে প্রদর্শিত রূপ মুদ্রিত হয়।

অবজেক্ট তৈরি করা

অবজেক্ট তৈরির প্রস্তুতি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি তৈরির প্রাথমিক কাজ করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আয়ত্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন- বর্গাকার ও আয়তাকার আকৃতি তৈরি করা, বৃত্তাকার ও ডিম্বাকার আকৃতি তৈরি করা, বহুকোণ বিশিষ্ট আকৃতি, তারকার আকৃতি, পেঁচানো আকৃতি ইত্যাদি তৈরি করা। একটি অবজেক্ট তৈরির জন্য–

- মাউস পয়েন্টার দিয়ে, রেক্টেঙ্গেল টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সিলেক্টেড হবে।
- মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে এনে যেকোনো জায়গায় ক্লিক করে নিচের দিকে ডান কোনাকুনি এক ইঞ্চির মতো ড্রাগ করার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিলে একটি আয়তকার বা চতুর্ভুজ অবজেক্ট তৈরি হবে।

একই প্রক্রিয়ায় টুল বক্স থেকে অন্য যে কোনো অবজেক্ট টুল সিলেক্ট করে অন্যান্য অবজেক্ট তৈরির কাজ করতে হবে। কোনো অবজেক্টই সাধারণত একবারে তৈরি করা সম্ভব হয় না। বারবার অংশ বিশেষ মুছে বা পুরোটা মুছে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। এ জন্য অবজেক্ট সিলেক্ট করা এবং পুরো অবজেক্ট বা অবজেক্টের অংশবিশেষ মুছে ফেলার কাজ শিখে নেওয়া প্রয়োজন।

অবজেক্ট সিলেক্ট করা এবং অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা পাথ মুছে ফেলা

- অবজেক্টটি যদি রং দিয়ে পূরণ করা থাকে, তাহলে সিলেকশন টুল বা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টে ক্লিক করলে অবজেক্ট সিলেক্ট হবে। কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রেখে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে প্রান্তরেখার (Path) উপর বা অবজেক্টের প্রান্তরেখার উপর ক্লিক করলে সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট হবে।
- অবজেক্টের প্রান্তরেখা (Path) বা রেখাংশ সিলেক্ট করা ও মুছে ফেলার জন্য সিলেকশন টুল বা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা রেখাংশ সিলেক্ট করতে হবে। এরপর, কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস (Backspace) বা ডিলিট (Delete) বোতামে চাপ দিলে অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা রেখাংশ মুছে যাবে।

ব্যাকস্পেস (Backspace) বা ডিলিট (Delete) বোতামে চাপ দিলে অবজেক্টটি একেবারে মুছে যায়। এডিট (Edit) মেনু থেকে কাট (Cut) কমান্ড সিলেক্ট করলে অবজেক্টটি ক্লিপবোর্ড নামক অস্থায়ী স্মৃতিতে চলে যায় এবং অন্য কোনো অবজেক্ট কাট বা কপি না করা পর্যন্ত ক্লিপবোর্ডে অবস্থান করে। কোনো অবজেক্ট ক্লিপবোর্ডে থাকা অবস্থায় এডিট (Edit) মেনু থেকে পেস্ট (Paste) কমান্ড সিলেক্ট করলে অবজেক্টটি আবার ডকুমেন্টে ফিরে পাওয়া যায়।

পাথ বা প্রান্তরেখা

অবজেক্টের প্রান্তরেখা মূলত একাধিক রেখাংশ বা সেগমেন্ট (Segment)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। বিশেষ প্রয়োজনে একটিমাত্র রেখাংশ বা সেগমেন্ট বিশিষ্ট রেখাও ব্যবহার করতে হয়। অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা বর্ডার রেখাকে বলা হয় পাথ (Path)। একটিমাত্র সরল রেখাকেও পাথ (Path) বলা হয়।

সিলেকশন টুল

- সম্পূর্ণ অবজেক্ট বা অবজেক্টের অংশবিশেষ সিলেক্ট করার জন্য সিলেকশন টুল, ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল বা গ্রুপ সিলেকশন টুল ব্যবহার করতে হয়।
- সিলেকশন টুলকে কালো তীর (Black Arrow) বলেও উল্লেখ করা হয়। সিলেকশন টুল ব্যবহার করার জন্য মাউস পয়েন্টার দিয়ে সিলেকশন টুলের উপর ক্লিক করলে টুলটি সিলেক্টেড হয়। টুলটি সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার পর্দার উপরে নিয়ে এলে মাউস পয়েন্টারটি কালো তীর বা সিলেকশন টুলের রূপ ধারণ করে। এ অবস্থায় সিলেকশন টুল (Selection Tool) দিয়ে অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট হয়। সিলেকশন টুল ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য।
- সিলেকশন টুল দিয়ে কোনো অবজেক্ট সিলেক্ট করলে অবজেক্টের চারদিকে আয়তাকার বা বৃত্তাকার বক্স বা বাউন্ডিং বক্স তৈরি হয়। বক্সের চার কোণে চারটি এবং চার বাহুতে চারটি ক্ষুদ্র ফাঁপা বক্স দেখা যায়। এ বক্সগুলোকে বলা হয় রিসাইজ বক্স (Resize Box)। রিসাইজ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্রাগ করে অবজেক্টের আকার যেকোনো দিক থেকে ছোটো-বড়ো করা যায়। কীবোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে ড্রাগ করলে অবজেক্ট আনুপাতিক হারে ছোটো-বড়ো হবে।
- সিলেকশন টুলের সাহায্যে সিলেক্ট করা অবজেক্টের কেন্দ্রবিন্দুতে বা যে কোনো বাহুতে বা অবজেক্টের যে কোনো অংশে ক্লিক ও ড্রাগ করে অবজেক্টকে এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে স্থাপন করা যাবে।

একসঙ্গে একাধিক অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য –

- প্রথম অবজেক্ট সিলেক্ট করার পর কীবোর্ডের শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে পরবর্তী অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হয়। এভাবে যতগুলো অবজেক্ট প্রয়োজন সিলেক্ট করা যাবে। সবগুলো অবজেক্ট সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় অবজেক্টগুলোর চারদিক দিয়ে একটিমাত্র বাউন্ডিং বক্স থাকবে।
- বাউন্ডিং বক্সের রিসাইজ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্রাগ করে সবগুলো অবজেক্ট একসঙ্গে ছোটো-বড়ো করা যাবে।
- অবজেক্টকে সিলেকশনমুক্ত করার জন্য পর্দার যেকোনো ফাঁকা জায়গায় মাউস পয়েন্টার ক্লিক করতে হবে। একাধিক সিলেক্ট অবজেক্ট থেকে নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্ট সিলেকশনমুক্ত করার জন্য শিফট (Shift) বোতাম চেপে রেখে ওই অবজেক্টে ক্লিক করতে হবে।

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল

সিলেকশন টুলের ডান পাশের সাদা টুলটি হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল (Direct Selection Tool)। এ টুলটিকে অনেকে সাদা তীর (White Arrow) বলেও অভিহিত করে থাকেন।

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল বা সাদা তীর ব্যবহার করা হয় অবজেক্টের পাথের অংশ বিশেষ (Segment) এবং সম্পূর্ণ অবজেক্ট সিলেক্ট করার জন্য।

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টের যেকোনো অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট সিলেক্ট করে অবজেক্টের অংশ বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে ছোটো-বড়ো করা যায়।

অবজেক্ট গ্রুপ করা

অনেকগুলো বৃত্তাকার, ডিম্বাকার, বর্গাকার ও আয়তাকার অবজেক্ট তৈরি করার পর অবজেক্টগুলোর গ্রুপ তৈরির জন্য –

ক. সকল অবজেক্ট বা প্রয়োজনীয় অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করতে হবে।

খ. অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে গ্রুপ (Group) কমান্ড দিলে সিলেক্টেড অবজেক্টগুলো গ্রুপবদ্ধ হয়ে যাবে।

পরীক্ষা করে দেখার জন্য ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করে সব অবজেক্ট সিলেকশনমুক্ত করার পর কালো তীর বা সিলেকশন টুল দিয়ে যেকোনো একটি অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে গ্রুপবদ্ধ সব অবজেক্টের চারপাশ ঘিরে একটি আয়তাকার বাউন্ডিং বক্স তৈরি হবে। এতে বোঝা যাবে সিলেকশন বক্সের ভেতরের অবজেক্টগুলো একই সঙ্গে সিলেক্ট হয়েছে।

গ্রুপবদ্ধ অবজেক্টগুলো গ্রুপমুক্ত করার জন্য –

ক. যে কোনো অবজেক্টের উপর ক্লিক করলে গ্রুপবদ্ধ অবজেক্টগুলো সিলেক্ট হবে।

খ. অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে আনগ্রুপ (Ungroup) কমান্ড দিলে গ্রুপবদ্ধ অবজেক্টগুলো গ্রুপমুক্ত হয়ে যাবে।

অবজেক্ট লক করা

একাধিক অবজেক্ট নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনো একটি বা একাধিক অবজেক্ট লক (Lock) করে রাখতে হয়। লক করা অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায় না। কাজেই, ওই অবজেক্ট সম্পাদনা করা যায় না। ফলে, লক করা অবজেক্ট অসাবধানতার কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

অবজেক্ট লক করার জন্য –

ক. নির্দিষ্ট অবজেক্টটি সিলেক্ট করতে হবে।

খ. অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে লক (Lock) কমান্ড দিতে হবে।

কাজ করার কোনো পর্যায়ে লক করা অবজেক্ট পুনরায় সম্পাদনা বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে অবজেক্টটি লকমুক্ত বা আনলক (Unlock) করে নিতে হয়। অবজেক্ট আনলক করার জন্য –

অবজেক্ট (Object) মেনু থেকে আনলক অল (Unlock All) কমান্ড দিতে হবে। এতে লক করা সকল অবজেক্ট লকমুক্ত বা আনলক হয়ে যাবে। লকমুক্ত বা আনলক করা অবজেক্ট স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদনা করা যাবে।

কাট, কপি, পেস্ট কমান্ডের ব্যবহার

সিলেকশন টুলের সাহায্যে কোনো অবজেক্ট সিলেক্ট করার পর এডিট মেনুর কাট (Cut) কমান্ড দিলে অবজেক্টটি কাট হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কপি (Copy) কমান্ড দিলে অবজেক্টটি কপি হয়। কাট ও কপি করা কোনো অবজেক্ট কম্পিউটারের ক্লিপবোর্ডে জমা থাকে। অতঃপর এডিট মেনু থেকে পেস্ট (Paste) কমান্ড প্রদান করলে এ অবজেক্ট পর্দায় পেস্ট হয় বা স্থাপিত হয়। অতঃপর সিলেকশন টুলের সাহায্যে ড্র্যাগ করে পেস্ট করা অবজেক্ট প্রয়োজনীয় স্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যায়।

কীবোর্ডের Alt বোতাম চেপে রেখে কোনো অবজেক্ট ড্র্যাগ করলে ওই অবজেক্টের হুবহু কপি তৈরি হয়ে স্থানান্তরিত হয়। ২০২১

এডিট মেনুর Paste In Front কমান্ড দিলে কপি করা অবজেক্ট উক্ত অবজেক্টের ঠিক উপর স্থাপিত হয়। এডিট মেনুর Paste In Back কমান্ড দিলে কপি করা কোনো অবজেক্ট উক্ত অবজেক্টের ঠিক পিছনে স্থাপিত হয়।

লেয়ার

Layer শব্দের বাংলা হতে পারে স্তর। লেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবজেক্ট ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রেখে কাজ করা যায়। এই স্তর বা লেয়ারকে স্বচ্ছ কাচ, পলিথিন ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তিনটি কাচের উপর বা অন্যান্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তিনটি অবজেক্ট বা ছবি তৈরি করে একটির উপর একটি স্থাপন করলে ৩টি অবজেক্ট বা ছবিই দেখা যাবে। এই ৩টি কাচ বা মাধ্যমকে ৩টি লেয়ার হিসেবে ধরা যেতে পারে।

লেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করার সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– লেয়ারসমূহের মধ্যে স্তর বিন্যাস পরিবর্তন করা, কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক অবজেক্ট অদৃশ্য করে রাখা, কাজের সুবিধার্থে লেয়ার লক করে রাখা, নতুন লেয়ার যোগ করা এবং অপ্রয়োজনীয় লেয়ার বাতিল করা ইত্যাদি।

নতুন লেয়ার তৈরি করা

পর্দায় লেয়ার প্যালেট দেখা না গেলে Window মেনু থেকে Layers কমান্ড দিলে পর্দায় লেয়ার প্যালেট উপস্থাপিত হবে। শুরুতে লেয়ার প্যালেটে একটিমাত্র লেয়ার থাকবে। একটি লেয়ারের কাজ শেষে অন্য লেয়ারে নতুন অবজেক্ট তৈরির জন্য লেয়ার প্যালেটে নতুন লেয়ার যোগ করে নিতে হবে। নতুন লেয়ার যোগ করার জন্য –

ক. লেয়ার প্যালেটের নিচের সারিতে Create New layer আইকন ক্লিক করলে লেয়ার প্যালেটে একটি নতুন লেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ. ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত লেয়ারকে নির্দিষ্ট কোনো নামে চিহ্নিত করার জন্য লেয়ারটির উপর ডবল ক্লিক করলে লেয়ার অপশনস (Layer Options) নামে একটি ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে। ডায়ালগ বক্সের নেম (Name) ঘরে প্রয়োজনীয় নাম টাইপ করে OK বোতামে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট লেয়ারটির ক্রমিক সংখ্যা বা নাম (যদি পূর্বে দেওয়া হয়ে থাকে) ডায়ালগ বক্সে টাইপ করা নামে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

লেয়ার বাতিল করা

ক. লেয়ারটি সিলেক্ট করে লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে ডিলিট (Delete) কমান্ড সিলেক্ট করলে সিলেক্ট করা লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে।

- আর্টওয়ার্ক বা অবজেক্ট বিশিষ্ট লেয়ার বাতিল করার প্রক্রিয়ায় একটি সতর্কতাসূচক বার্তা প্রদর্শিত হবে "লেয়ারটি বাতিল করতে চান কি-না।" OK বোতামে ক্লিক করলে লেয়ারটি বাতিল হয়ে যাবে এবং NO বোতামে ক্লিক করলে বাতিল প্রক্রিয়া রদ হয়ে যাবে। তবে, লেয়ারটিতে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ডিলিট (Delete) আইকনের উপর ছেড়ে দিলে এরূপ বার্তা আসবে না।

লেয়ার একীভূত করা

দুটি বা আরও বেশি সংখ্যক লেয়ারের অবজেক্ট তৈরি ও সম্পাদনার কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ওই লেয়ারগুলো একীভূত করে নেওয়া যেতে পারে। লেয়ার একীভূত করার জন্য –

ক. সংশ্লিষ্ট লেয়ারগুলো সিলেক্ট করে নিতে হবে।

খ. লেয়ার প্যালেটের পপ-আপ মেনু থেকে Merge Selected কমান্ড সিলেক্ট করলে লেয়ারগুলো একীভূত (Merge) হয়ে যাবে।

অবজেক্টে রঙের ব্যবহার

অবজেক্ট তৈরির পর প্রয়োজন অনুযায়ী রং প্রয়োগ করতে হয়। অবজেক্টে রং প্রয়োগ করার জন্য কালার প্যালেট, কালার বার বা কালার স্পেকট্রাম বার, গ্রেডিয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

কালার প্যালেট

পর্দায় কালার প্যালেট দেখা না গেলে উইন্ডো (Window) মেনুর কালার (Color) কমান্ড দিলে পর্দায় কালার প্যালেট উপস্থাপিত হবে।

- কালার প্যালেটের বাম পাশের উপরের দিকে রয়েছে ফিল ও স্ট্রোক নির্দেশক Indicator বক্স বা Swatch। এর নিচেই রয়েছে কালার স্লাইডার (Color Slider) এবং তার নিচে কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)। Grayscale রঙের মডেলে কাজ করলে কালার স্লাইডার থাকে ১টি, RGB = Red Green Blue মোডে কাজ করলে কালার স্লাইডার থাকে ৩টি এবং CMYK= Cyan Magenta Yellow Black মোডে কাজ করলে কালার স্লাইডার থাকে ৪টি।

রং প্রয়োগ করা

কোনো অবজেক্টে রং প্রয়োগ করার জন্য –

ক. অবজেক্টটি সিলেক্ট করতে হবে।

খ. কালার প্যালেটের ফিল (Fill) নির্দেশক বক্সে ক্লিক করে সক্রিয় করলে ফিল সোয়াচটি সক্রিয় হবে। সক্রিয় ফিল সোয়াচটি স্ট্রোক আইকনের উপরে অবস্থান করবে।

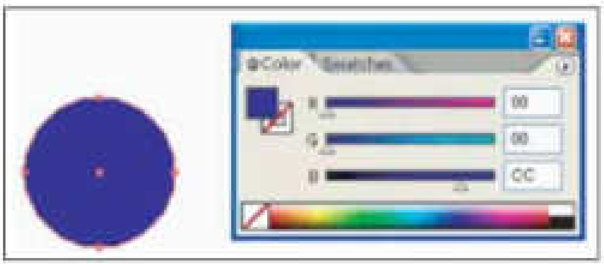

গ. কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ প্রয়োজনীয় রঙের উপর ক্লিক করতে হবে। সিলেক্টেড অবজেক্টটি কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এ ক্লিক করা রঙে পূরণ (Fill) হবে। কালার স্পেকট্রাম বার (Color Spectrum Bar)-এর একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছে সম্পূর্ণ সাদা এবং সম্পূর্ণ কালো রঙের সোয়াচ। কালো সোয়াচে ক্লিক করলে অবজেক্ট সম্পূর্ণ কালো রঙে এবং সাদা সোয়াচে ক্লিক করলে অবজেক্ট সম্পূর্ণ সাদা রঙে পূরণ (Fill) হবে।

স্ট্রোকের ব্যবহার

অবজেক্টের প্রান্তরেখা বা লাইন বা বর্ডারকে বলা হয় পাথ। পাথ বা রেখা মোটা-চিকন করার পরিমাপকে স্ট্রোক (Stroke) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বন্ধপাথ বিশিষ্ট অবজেক্ট এবং মুক্তপাথ বিশিষ্ট অবজেক্ট, সরল এবং আঁকাবাঁকা লাইন ইত্যাদি সব ধরনের রেখাতেই স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণের কাজ করা যায়। স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ হচ্ছে রেখাকে মোটা-চিকন করা এবং রং প্রয়োগ করা।

স্ট্রোক মোটা-চিকন করার কাজ করতে হয় স্ট্রোক (Stroke) প্যালেটের সাহায্যে। এ জন্য-

ক. অবজেক্ট বা পাথ সিলেক্ট করতে হবে। পর্দায় যদি স্ট্রোক প্যালেট না থাকে তাহলে উইন্ডো (Window) মেনু থেকে স্ট্রোক (Stroke) কমান্ড দিলে পর্দায় স্ট্রোক প্যালেট পাওয়া যাবে।

খ. অবজেক্ট বা রেখা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় স্ট্রোক প্যালেটের ওয়েট (Weight) ঘরের ড্রপ-ডাউন মেনুর নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে মাউস চেপে রাখলে ড্রপ-ডাউন তালিকায় অনেক মাপসূচক সংখ্যা পাওয়া যাবে। এ তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সংখ্যা সিলেক্ট করতে হবে। ছোটো সংখ্যা সিলেক্ট করলে রেখা চিকন হবে, বড়ো সংখ্যা সিলেক্ট করলে রেখা মোটা হবে।

ঘ. প্রয়োজন হলে ওয়েট (Weight) ঘরে সরাসরি মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করা যায়। দশমিকযুক্ত সংখ্যাও ব্যবহার করা যায়। রেখার সরু বা মোটার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য শূন্য (০) থেকে ১০০০ পয়েন্ট পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

পেন ও পেনসিল টুল

ইলাস্ট্রেটর জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে পেন টুল (PenTool)-এর ব্যবহার। পেন টুলের সাহায্যে সূক্ষ্ম ও জটিল ডিজাইন তৈরি করা যায় এবং সম্পাদনার কাজ করা যায়।

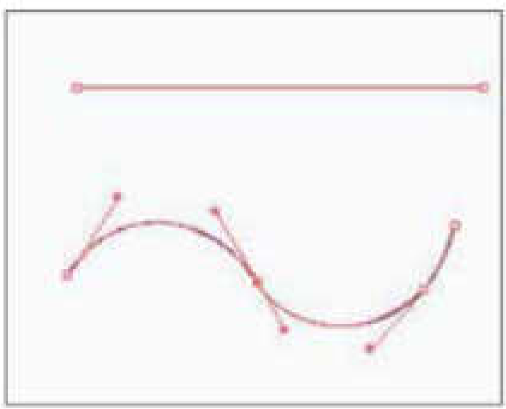

একটি সরল পাথ বা রেখার দুই প্রান্তে দুটি অ্যাংকর পয়েন্ট থাকে। প্রথম অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টকে সূচনা পয়েন্ট (Starting Point) এবং দ্বিতীয় অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টকে সমাপ্তি পয়েন্ট (End Point) বলা হয়।

বক্রপাথ বা বক্ররেখা (Curve Path)-এর অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টগুলোর সঙ্গে কন্ট্রোল হ্যান্ডেল (Control Handle) এবং কন্ট্রোল হ্যান্ডেলের বাইরের প্রান্তে কন্ট্রোল পয়েন্ট থাকে (Control Point) থাকে। কন্ট্রোল হ্যান্ডলের বাইরের প্রান্তে বা মাথায় অবস্থিত কন্ট্রোল পয়েন্ট (Control Point)-এ ক্লিক ও ড্র্যাগ করে রেখার বক্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট, কন্ট্রোল হ্যান্ডল এবং কন্ট্রোল পয়েন্ট কোনোটিই মুদ্রণে আসে না।

পেনসিল টুল আসলে পেন টুলেরই আর এক রূপ। পেনসিল টুল (Pencil Tool)-এর সাহায্যে একবারে টেনে আঁকাবাঁকা লাইন বা পাথ তৈরি করা যায়।

পেন টুল হচ্ছে ভেক্টর অবজেক্ট তৈরির প্রধানতম টুল। পেন টুলের সাহায্যে যেকোনো আকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাথের সাহায্যে নিখুঁত অবজেক্ট তৈরি করা যায়।

বন্ধপাথ ও খোলা বা মুক্ত পাথ

বন্ধ পাথের শুরু ও শেষ বলে কিছু থাকে না। যেমন- বৃত্ত, বর্গ ইত্যাদি। বন্ধ পাথ (Close Path) আঁকাবাঁকা প্রান্ত বিশিষ্টও হতে পারে। পক্ষান্তরে, খোলা বা মুক্তপাথ (Open Path)-এর শুরুর প্রান্ত এবং শেষের প্রান্ত থাকে।

পেনসিল টুল ও পেন টুল

পেনসিল টুলের সাহায্যে সবচেয়ে সহজ উপায়ে পাথ তৈরি করা যায়। টুলবক্স থেকে পেনসিল টুল সিলেক্ট করার পর পর্দায় ক্লিক ও ড্রাগ করে একটানা আঁকাবাঁকা দাগ টেনে লাইন তৈরির পদ্ধতিতে পাথ তৈরি করা যায়। পেনসিল টুলের কাজ হচ্ছে কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে রেখা টেনে ছবি আঁকার মতো।

পক্ষান্তরে, পেন টুল দিয়ে পাথ তৈরি করা হয় ক্লিক ও ড্রাগ করে। পেন টুলের সাহায্যে পাথ তৈরির জন্য–

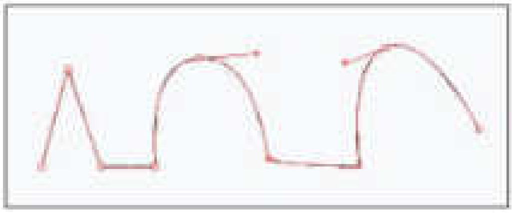

ক. টুলবক্স থেকে পেন টুল সিলেক্ট করতে হবে। পেন টুলের সাহায্যে পর্দার যেকোনো জায়গায় ক্লিক করার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

খ. কিছুটা উপরের দিকে দ্বিতীয় ক্লিক করে মাউসের চাপ ছেড়ে দিতে হবে।

গ. দ্বিতীয় ক্লিকের অবস্থান থেকে নিচের দিকে একটু ডানে ক্লিক করতে হবে।

ঘ. উপরের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করার পর মাউসে চাপ রেখে ডান দিকে ড্রাগ করতে হবে।

ঙ. নিচের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করতে হবে। এ ক্লিকের অবস্থান থেকে একটু ডান দিকে পরবর্তী ক্লিক করতে হবে।

চ. উপরের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করার পর মাউসে চাপ রেখে ডান দিকে ড্রাগ করতে হবে।

ছ. নিচের দিকে একটু ডানে সরে ক্লিক করতে হবে।

এভাবে ক্লিক ও ড্রাগ করে ঢেউয়ের মতো মুক্ত পাথ বিশিষ্ট অবজেক্ট তৈরি করা যেতে পারে।

পাথ সম্পাদনার কাজ

প্রথমবারেই একটি পাথ প্রত্যাশিত আকারে তৈরি করা সম্ভব হয় না। প্রথমবারে পাথটি তৈরি করার পর নানা প্রকার সম্পাদনার মাধ্যমে পাথটি প্রত্যাশিত আকারে নিয়ে আসতে হয়। পাথ সম্পাদনার জন্য পাথের যেকোনো স্থানে নতুন অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট যোগ করা যায়, পাথে বিদ্যমান অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বাতিল করে দেওয়া যায় বা ফেলে দেওয়া যায়, পাথের অংশ বিশেষ কেটে বাদ দেওয়া যায়, পাথের দুটি বিচ্ছিন্ন প্রান্ত সংযুক্ত করা যায়। এভাবে যেকোনো পরিবর্তন যতবার প্রয়োজন করা যায়।

অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট যোগ করা

পাথের কোনো অবস্থানে অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট যোগ করার জন্য –

ক. টুলবক্স থেকে এ্যাড অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল (Add Anchor Point Tool) সিলেক্ট করতে হবে। অ্যাড অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করার পর মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে পেন টুলের নিচের ডান দিকে একটি যোগচিহ্ন (+) দেখা যাবে।

খ. অ্যাড অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল দিয়ে পাথের কোনো স্থানে ক্লিক করলে ঐ স্থানে নতুন অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বসে যাবে।

- সোজা পাথের উপর যোগ করা নতুন অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট হবে স্ট্রেইট কর্নার অ্যাংকর পয়েন্ট এবং বক্র পাথের উপর যোগ করা অ্যাংকর পয়েন্ট হবে স্মুথ অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট।

অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বাদ দেওয়া

পাথে বিদ্যমান কোনো অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট বাদ দেওয়ার জন্য –

ক. ডিলিট অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল (Delete Anchor Point Tool) সিলেক্ট করতে হবে। ডিলিট অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করার পর মাউস পয়েন্টার পর্দার ভেতরে নিয়ে এলে পেন টুলের নিচের ডান দিকে বিয়োগ চিহ্ন (-) দেখা যাবে।

খ. ডিলিট অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্ট টুল দিয়ে কোনো এ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে ঐ অ্যাংকর পয়েন্টটি বাতিল হয়ে যাবে।

পাথের বক্রতা সম্পাদনা

পাথ সম্পাদনার কাজ করার জন্য একটি বৃত্ত/আয়তাকার অবজেক্ট বা পেন/পেনসিল টুল দিয়ে নকশা তৈরি করে নিতে হবে। এরপর বক্রতা সম্পাদনার জন্য –

ক. ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করার পর ড্র্যাগ করে অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের অবস্থান পরিবর্তন করলে পাথের বক্রতা ও আকার-আকৃতি পরিবর্তিত হবে।

খ. অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে ঐ অ্যাংকর পয়েন্টের হ্যান্ডল দৃশ্যমান হবে। হ্যান্ডলের যেকোনো প্রান্তের কন্ট্রোল পয়েন্টে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে অ্যাংকর পয়েন্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাথের অংশ বা রেখাংশের বক্রতা বাড়াতে বা কমাতে হবে, বক্রতার পরিমাণ কম-বেশি করতে হবে বা বক্রতার দিক পরিবর্তন করতে হবে।

পেনসিল টুল এবং পেন টুল দিয়ে মুক্ত পাথ তৈরি করার পর স্ট্রোক হিসেবে মোটা-চিকন করা যাবে এবং রং আরোপ করা যাবে। পেনসিল টুল এবং পেন টুল দিয়ে বন্ধ পাথ তৈরি করার পর ফিল কালার দিয়ে যেকোনো রঙে পূরণ করা যাবে।

লেখালেখির কাজ

বই ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, কার্ড ইত্যাদি সব কিছুতেই লেখার কাজ থাকে। ইলাস্ট্রেটরে লেখালেখি বা টাইপের কাজ করার জন্য টাইপ টুল (Type Tool) ব্যবহার করা হয়। ইলাস্ট্রেটরে ৬ প্রকার টাইপ টুল রয়েছে। এসব টাইপ টুলের সাহায্যে তিনভাবে লেখা বিন্যাসের কাজ করতে হয়। যেমন- পয়েন্ট টেক্সট (Point Text), এরিয়া টেক্সট (Area Text) এবং পাথ টেক্সট (Path Text)।

পয়েন্ট টেক্সট

পয়েন্ট টেক্সট (Point Text) পদ্ধতিতে টাইপ করার নিয়ম খুবই সহজ। এ পদ্ধতিতে টাইপ করার জন্য–

ক. টুলবক্স থেকে টাইপ টুল (Type Tool) সিলেক্ট করতে হবে।

খ. পর্দার যেকোনো ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করতে হবে।

গ. বাংলায় টাইপ করার জন্য কীবোর্ডকে বাংলা কীবোর্ডে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

ঘ. পর্দার উপরে রিবনে ক্যারেক্টার (Character) লেখার উপর ক্লিক করলে ক্যারেক্টার (Character) প্যালেট পাওয়া যাবে। ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটের ফন্ট (Font) পপ-আপ মেনু থেকে সিলেক্ট করতে হবে।

ঙ. ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের নিয়মে টাইপ করার কাজ শুরু করতে হবে। সিলেকশন টুল দিয়ে যেকোনো অক্ষরের উপর ক্লিক করলে লেখাগুলোর নিচে একটি রেখা দেখা যাবে। এই রেখাকে বলা হয় বেজলাইন (Baseline)।

লেখা সম্পাদনা

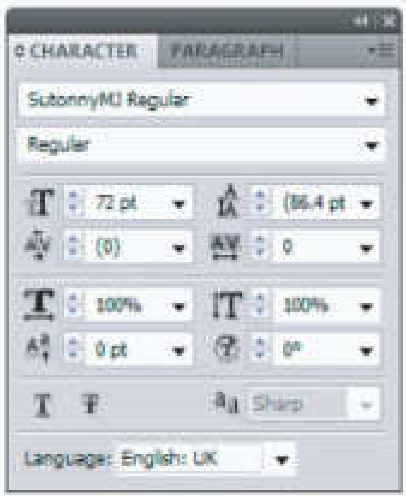

লেখা সম্পাদনার প্রয়োজনীয় কমান্ডগুলো পাওয়া যায় টাইপ (Type) মেনুতে এবং ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটে। উইন্ডো মেনুর টাইপ (Type) কমান্ড থেকে ক্যারেক্টার (Character) সিলেক্ট করলে অথবা কীবোর্ডের কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম চেপে রেখে ঐ বোতামে চাপ দিলে পর্দায় ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটটি ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ক্যারেক্টার (Character) প্যালেট ভাসমান থাকা অবস্থায় যখন প্রয়োজন তখনই ব্যবহার করা যাবে।

অক্ষর সিলেক্ট করা

টাইপ টুল সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের নিয়মে অক্ষর, শব্দ সিলেক্ট করতে হবে। ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে লেখার মধ্যে ক্লিক করলে একবারে টাইপ করা সবটুকু অংশ, অর্থাৎ একই বেজলাইন বিশিষ্ট পুরো লেখা সিলেক্টেড হবে। এ ক্ষেত্রে অক্ষরগুলো হাইলাইটেড হবে না। অক্ষরের নিচ দিয়ে বেজলাইন দেখা যাবে।

অক্ষরের রং পরিবর্তন করা

অক্ষরের রং পরিবর্তন করার জন্য –

ক. প্রয়োজনীয় অক্ষর বা যেকোনো পরিমাণ লেখা সিলেক্ট করতে হবে।

খ. কালার প্যালেটের বার-এ বা সোয়াচ প্যালেটের যে রঙের উপর ক্লিক করা হবে, সিলেক্টেড অক্ষর/শব্দ/লেখায় সেই রং আরোপিত হবে।

অক্ষর মুছে ফেলা

এক বা একাধিক অক্ষর বা শব্দ, অনুচ্ছেদ বা গোটা লেখা সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস বা ডিলিট (Backspace/Delete) বোতামে চাপ দিলে সিলেক্টেড অক্ষর বা শব্দ বা অনুচ্ছেদ বা গোটা লেখা মুছে যাবে।

অক্ষর ছোটো -বড়ো করা

ক. অক্ষর বা অক্ষরগুলো বা পুরো শব্দ সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় ক্যারেক্টার প্যালেটের ফন্ট সাইজ (Font Size) ঘরের ডান দিকের নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করে মাউস চেপে রাখলে অক্ষরের আকার (Font Size)-এর মাপসূচক সংখ্যার তালিকা দেখা যাবে। মাউসে চাপ রাখা অবস্থায় ড্রাগ করে কোনো মাপসূচক সংখ্যার উপর নিয়ে গেলে ওই মাপসূচক সংখ্যাটি সিলেক্ট হবে। মাপসূচক সংখ্যাটি সিলেক্ট হওয়ার পর মাউসের চাপ ছেড়ে দিলে সিলেক্ট করা অক্ষর বা অক্ষরগুলো ওই মাপ অনুযায়ী ছোটো-বড়ো হবে।

খ. ড্রপ-ডাউন মেনু তালিকায় প্রয়োজনীয় মাপসূচক সংখ্যা পাওয়া না গেলে সরাসরি ফন্ট সাইজ (Font Size) ঘরে ক্লিক করে ইনসার্শন পয়েন্টার বসাতে হবে।

- কীবোর্ডের ব্যাকস্পেস (Backspace) বোতামে চাপ দিয়ে বিদ্যমান মাপসূচক সংখ্যা মুছে ফেলে নতুন মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করতে হবে।
- কীবোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলে টাইপ করা মাপসূচক সংখ্যা অনুযায়ী সিলেক্ট করা অক্ষর বা অক্ষরগুলো ছোটো-বড়ো হয়ে যাবে।

অক্ষরকে খাড়াখাড়ি এবং পাশাপাশি ছোটো -বড়ো করা

লেখার অক্ষরগুলোকে খাড়াখাড়ি ছোটো-বড়ো করার জন্য-

ক. ভার্টিক্যাল স্কেল (Vertical Scale) ঘরের ডান দিকের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে সংখ্যাসূচক তালিকা পাওয়া যাবে। মাউসে চাপ রাখা অবস্থায় ড্রাগ করে ১০০%-এর চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যা সিলেক্ট করলে লেখা খাড়াখাড়িভাবে বড়ো হবে এবং ১০০%-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা টাইপ করলে লেখা খাড়াখাড়িভাবে ছোটো হবে। ১০০% হচ্ছে অক্ষরের স্বাভাবিক মাপ।

লেখার অক্ষরগুলোকে পাশাপাশি ছোটো-বড়ো করার জন্য-

খ. হরাইজন্টাল স্কেল (Horizontal Scale) ঘরের ডান দিকের ড্রপ-ডাউন তীরে ক্লিক করে মাউসে চাপ রাখলে সংখ্যাসূচক তালিকা পাওয়া যাবে। মাউসে চাপ রাখা অবস্থায় ড্রাগ করে ১০০%-এর চেয়ে বৃহত্তর সংখ্যা সিলেক্ট করলে লেখা পাশাপাশি বড়ো হবে এবং ১০০%-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা টাইপ করলে লেখা পাশাপাশি ছোটো হবে। ১০০% হচ্ছে অক্ষরের স্বাভাবিক মাপ।

বেজলাইন শিফট

ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে লেখা সিলেক্ট করলে লেখার নিচ দিয়ে যে লাইন দেখা যায় সেই লাইনকে বলা হয় বেজলাইন (Baseline)। বেজলাইন থেকে লেখার নিচের প্রান্ত উপরে তুলে নেওয়া বা নিচে নামিয়ে আনাকেই বলা হয় বেজলাইন শিফট (Baseline Shift)।

- ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটের সেট দি বেজলাইন শিফট (Set the Baseline Shift) ঘরের ড্রপ-ডাউন মেনু তালিকা থেকে মাপসূচক সংখ্যা সিলেক্ট করে অথবা সেট দি বেজলাইন শিফট (Set the Baseline Shift) ঘরে মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করে বেজলাইন শিফট (Baseline Shift)-এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করলে অক্ষর বেজলাইন থেকে নিচের দিকে নেমে আসে এবং ধনাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করলে লেখা বেজলাইন থেকে উপরের দিকে উঠে যায়।

লিডিং

লাইনগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাকে বলা হয় লিডিং (Leading)। একাধিক লাইন বিশিষ্ট লেখার ক্ষেত্রে লিডিং কম-বেশি করার প্রয়োজন হতে পারে।

ক. ক্যারেক্টার (Character) প্যালেটের সেট দি লিডিং (Set the Leading) ঘরের ড্রপ-ডাউন মেনু তালিকা থেকে মাপসূচক সংখ্যা সিলেক্ট করে অথবা সেট দি লিডিং (Set the Leading) ঘরে সরাসরি মাপসূচক সংখ্যা টাইপ করার পর কীবোর্ডের এন্টার (Enter) বোতামে চাপ দিলে লিডিং (Leading) কার্যকর হবে।

খ. সেট দি লিডিং (Set the Leading) ঘরের ঊর্ধ্বমুখী তীর বোতামে চাপ দিলে লিডিংয়ের পরিমাণ বাড়বে এবং নিম্নমুখী তীর বোতামে চাপ দিলে লিডিংয়ের পরিমাণ কমবে।

এরিয়া টেক্সট

বর্গাকার বা আয়তাকার, বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার বা অন্য যেকোনো প্রকার বন্ধ পাথের ভেতরে টাইপ করা বা স্থাপিত লেখাকে এরিয়া টেক্সট (Area Text) বলা হয়। বন্ধপাথের মধ্যে লেখা বিন্যস্ত করার জন্য বা টাইপ করার জন্য–

ক. বর্গাকার বা আয়তাকার, বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার বন্ধপাথ তৈরি করে নিতে হবে।

খ. টাইপ টুল সিলেক্ট করে মাউস পয়েন্টার বন্ধপাথের উপর স্থাপন করলে টাইপ টুলটি এরিয়া টাইপ টুলের রূপ ধারণ করবে।

গ. পাথের অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে বন্ধপাথের ভেতরে ইনসার্শন পয়েন্টার বসে যাবে এবং বন্ধপাথটি টেক্সট বক্স (Text Box) বা লেখার আধার (Text Container) হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ঘ. টাইপের কাজ শুরু করতে হবে।

ঙ. টাইপ করে ডান পাশের প্রান্তে পৌঁছে গেলে ইনসার্শন পয়েন্টার আপনাআপনিই নিচের লাইনে চলে আসবে। এভাবে টাইপ করে যেতে থাকলে একটি লাইন শেষ হওয়ার পর আপনাআপনিই পরবর্তী লাইন শুরু হবে।

পাথে টাইপ করা

ইলাস্ট্রেটরের পাথ টাইপ টুলের সাহায্যে বন্ধ পাথের বাইরের দিকে ও ভেতরে দিকে এবং মুক্ত পাথের উপরের দিকে ও নিচের দিকে টাইপের কাজ করা যায়। মনোগ্রাম জাতীয় কাজের জন্য বৃত্ত বা বর্গাকার অবজেক্টের বাইরের দিকে বা ভেতরের দিকে টাইপের কাজ করতে হয়।

বৃত্তাকার অবজেক্টের বাইরের দিকে টাইপ করা

ক. বৃত্তাকার অবজেক্ট তৈরি করতে হবে এবং বৃত্তটি রং দ্বারা পূরণ (Fill) করা থাকলে কালার প্যালেটের None আইকন বা টুল বক্সের None আইকন ক্লিক করে বৃত্তটির রং বাদ দিতে হবে।

খ. বৃত্তটি সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় টুল বক্স থেকে টাইপ অন-এ পাথ টুল (Type on a Path Tool) সিলেক্ট করতে হবে এবং টাইপ অন-এ পাথ টুল (Type on a Path Tool) দিয়ে বৃত্তটির অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে বৃত্তটির পাথের বাইরে ইনসার্শন পয়েন্টার বসে যাবে।

- ক্লিক করার সময় বৃত্তটি সিলেক্টেড থাকতে হবে। কোনো কারণে সিলেক্টেড না থাকলে সিলেক্ট করে ১ ও ২ নম্বর ধাপের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

গ. টাইপের কাজ শুরু করলে স্বাভাবিক নিয়মে বাম দিক থেকে ডান দিকে টাইপ করা লেখা বৃত্তের পাথ ধরে অগ্রসর হয়ে যাবে। একই নিয়মে প্রয়োজন হলে আয়তাকার অবজেক্টের বাইরের দিকে লেখা বিন্যস্ত করতে হবে।

ঘ. ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল (Direct Selection Tool) দিয়ে লেখায় ক্লিক করলে বৃত্তের পাথ ও লেখার মধ্যে আই-বিম সিলেক্ট হবে।

ঙ. আই-বিমের উপরের বা নিচের প্রান্তে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে লেখাকে চক্রাকারে টেনে যেকোনো অবস্থানে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

মুক্তপাথে লেখা বিন্যস্ত করা

ক. পেনসিল টুল অথবা পেন টুলের সাহায্যে মুক্তপাথ বা রেখা তৈরি করতে হবে।

খ. সিলেক্টেড পাথের উপর পাথ টুল দিয়ে ক্লিক করলে পাথের উপর ইনসার্শন পয়েন্টার বসে যাবে।

গ. স্বাভাবিক নিয়মে টাইপ করতে হবে।

- ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে লেখায় ক্লিক করলে পাথ ও লেখা সিলেক্টেড হবে এবং সিলেক্টেড অবস্থায় আই-বিমে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে লেখা যেকোনো দিকে সরিয়ে স্থাপন করা যাবে।

- ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে পাথের উপর ক্লিক করলে পাথ সিলেক্টেড হবে এবং পাথের অ্যাংকর পয়েন্টগুলো দৃশ্যমান হবে। এ অবস্থায় পাথ সম্পাদনার নিয়মে পাথ আঁকাবাঁকা এবং ছোটো-বড়ো করা যাবে। পাথ আঁকাবাঁকা করলে লেখাও পাথের উপর আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হবে।
- লেখার তুলনায় পাথ ছোটো হলে বাড়তি লেখা দেখা যাবে না। পাথ বড়ো করে দিলে অবশিষ্ট লেখা দেখা যাবে।

অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করা

অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করা হলে অক্ষরের প্রান্তগুলো পাথে পরিণত হয়। আউটলাইনে পরিণত অক্ষরের পাথে এবং অ্যাংকর (Anchor) পয়েন্টে ক্লিক ও ড্রাগ করে অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যায়।

অক্ষরের আউটলাইন তৈরি করার জন্য –

ক. এক বা একাধিক অক্ষর বা শব্দ সিলেক্ট করতে হবে।

খ. টাইপ (Type) মেনু থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন (Create Outline) কমান্ড দিলে অথবা কীবোর্ডের শিফট (Shift) ও কন্ট্রোল (Ctrl) বোতাম একসঙ্গে চেপে রেখে O বোতামে চাপ দিলে সিলেক্ট করা লেখা আউটলাইন (Outline)-এ পরিণত হবে।

অক্ষর আউটলাইনে পরিণত হওয়ার পর লেখাগুলো আর ফন্ট হিসেবে থাকবে না। গ্রাফিক্সে পরিণত হবে। তখন পাথ সম্পাদনার নিয়মে অক্ষরের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা যাবে এবং যেকোনো রং আরোপ করা যাবে, গ্রেডিয়েন্ট প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু ফন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইলাস্ট্রেটরে ছবি বা ইমেজ স্থাপন করা

ছবি বা ইমেজ ইলাস্ট্রেটরে স্থাপন করার জন্য–

ক. ফাইল (File) মেনু থেকে প্লেস (Place) কমান্ড দিলে প্লেস (Place) ডায়ালগ বক্স পাওয়া যাবে।

খ. প্লেস (Place) ডায়ালগ বক্সে প্রয়োজনীয় ফাইলটি খুঁজে বের করে সিলেক্ট করতে হবে।

- আগে থেকে জানা থাকতে হবে প্রয়োজনীয় ফাইলটি কি নামে কোন ফোল্ডারে রয়েছে। নির্দিষ্ট ফোল্ডারটি খোলার পর প্রয়োজনীয় ফাইলটি সিলেক্ট করতে হবে।

গ. ডায়ালগ বক্সের প্লেস (Place) বোতামে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা ফাইলটির ছবি বা ইমেজ ইলাস্ট্রেটরের পর্দায় স্থাপিত হবে।

- ফটোশপের ছবি বা ইমেজ ইলাস্ট্রেটরে স্থাপিত হওয়ার পর গোটা ছবি বা ইমেজ জুড়ে একটি ক্রস চিহ্ন থাকবে। বাইরে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করলে ছবি থেকে ক্রস চিহ্ন চলে যাবে। সিলেকশন টুল দিয়ে ছবির উপর ক্লিক করলে ছবিটি সিলেক্টেড হবে, চার কোণে চারটি ও চার বাহুতে চারটি রিসাইজ বক্স বিদ্যমান থাকবে। রিসাইজ বক্সগুলোতে ক্লিক ও ড্রাগ করে ছবি ছোটো-বড়ো করা যাবে।

দলগত কাজ

- ফটোশপ ব্যবহার করে যেকোনো একটি ছবি সম্পাদনা করে দেখাও।
- যেকোনো একটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি মনোগ্রাম ইলাস্ট্রেটরে অঙ্কন কর।

*সফটওয়্যারের সংস্করণ ভিন্নতর কারণে টাইটেল ও মেনু বারের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে।

অনুশীলনী

১. মাল্টিমিডিয়া কয়টি প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত?

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৪

২. মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা হয় কোনটিতে?

ক. বিদ্যালয়ের ফলাফল প্রস্তুতিতে খ. বাজারের হিসাব করতে

গ. ক্রিকেট খেলার রান হিসাব করতে ঘ. অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তৈরিতে

৩. কোনটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার?

ক. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খ. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট

গ. মাইক্রোসফট এক্সেল ঘ. মাইক্রোসফট অ্যাকসেস

৪. মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ–

i. বর্ণ বা টেক্সট এর প্রকাশকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে

ii. মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে সহজ করেছে

iii. হিসাবের কাজকে সহজ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রকিব একটি কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা। আগামীকাল বিদেশ থেকে একদল পরিদর্শক তার কোম্পানি পরিদর্শনে আসবে। তিনি তাঁর ল্যাপটপে বসে ঠিক করছেন অতিথিদের তাঁর কোম্পানি সম্পর্কে কী কী দেখাবেন। একাজে তিনি একটি সফটওয়্যারের সাহায্য নিলেন।

৫. বিদেশি অতিথিদের সামনে উপস্থাপনের জন্য রকিব সাহেবের জন্য কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার সুবিধাজনক?

ক. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খ. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট

গ. মাইক্রোসফট এক্সেল ঘ. মাইক্রোসফট অ্যাকসেস

৬. রকিব সাহেব যে সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন তাতে–

i. অ্যানিমেশন ব্যবহার করে উপস্থাপনকে আকর্ষণীয় করা যাবে

ii. শব্দ ও ভিডিয়ো ব্যবহার করে কোম্পানির কার্যক্রম দেখানো যাবে

iii. কোম্পানির আয় ব্যয়ের হিসাব করা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. কোনো কিছু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৮. 'বর্তমানে প্রকাশনা শিল্প সম্পূর্ণভাবে গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল'– উক্তিটির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

এ অধ্যায় শেষে আমরা...

- সমস্যা সমাধান সম্পর্কে জানতে পারব;
- প্রোগ্রামিং ভাষা সম্পর্কে জানতে পারব;
- পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে কোডিং করতে পারব;
- পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে পারব।

সমস্যা সমাধানে প্রোগ্রামিং

বাস্তবজীবনে আমরা নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদেরকে ঐ সকল সমস্যার সমাধান করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সমস্যা সমাধান হল চ্যালেঞ্জ বা বাধা শনাক্ত করার প্রক্রিয়া, যাতে সমস্যার প্রকৃতি বোঝা যায় এবং এটি অতিক্রম করার উপায় খুঁজে বের করা হয়। এর সাথে পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, চিন্তা করা এবং সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করে নিয়ে আসার বিষয়টি জড়িত। এই প্রক্রিয়াতে সাধারণত সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা, সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, সেই বিকল্প সমাধানগুলো মূল্যায়ন করা এবং তারপরে সেরা সমাধানটি বাস্তবায়ন করা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রোগ্রামিং ভাষা

আমরা মনের ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করি যেমন- বাংলা, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, স্প্যানিশ ইত্যাদি। কিন্তু কম্পিউটার আমাদের এই সকল ভাষা সরাসরি বুঝতে পারে না। কম্পিউটারকে যেকোনো নির্দেশ দিতে গেলে কম্পিউটার বুঝতে পারে এমন ভাষায় নির্দেশ লিখতে হয়। কম্পিউটারসহ যেকোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস শুধুমাত্র ০ আর ১ কে বুঝতে পারে।

কিন্তু শুধু ০ আর ১ দিয়ে নিজেদের নির্দেশগুলো লিখে ফেলাও আমাদের জন্য কঠিন। আমরা মানুষরা সাধারণত যেসকল ভাষা ব্যবহার করি, সেগুলো শুধুমাত্র ০ আর ১ দিয়ে তৈরি নয়। তাহলে কম্পিউটারের সাথে কীভাবে আমরা যোগাযোগ করব? এমন কিছু ভাষা আছে, যেখানে ওই ভাষার রীতিনীতি অনুসরণ করে নির্দেশ লিখলে কম্পিউটার সেই ভাষাকে সহজেই নিজের বোঝার উপযোগী হিসাবে রূপান্তর করে নিয়ে নির্দেশগুলো বুঝতে পারে। এই ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা। অনেক রকম প্রোগ্রামিং ভাষা আছে। যেমন- সি, সি++, পাইথন, জাভা ইত্যাদি।

আমরা যেকোনো একটি প্রোগ্রামিং ভাষা শিখলে সেই ভাষার মাধ্যমে কম্পিউটারকে প্রয়োজনমত বিভিন্ন নির্দেশ দিতে পারব। আমাদের কম্পিউটারের একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনে প্রথমে আমরা নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় নির্দেশগুলো লিখে ফেলব। কম্পিউটারে এমন একটি রূপান্তর ব্যবস্থা থাকে যা সেই প্রোগ্রামিং ভাষার নির্দেশগুলোকে মেশিন কোডে রূপান্তর করে।

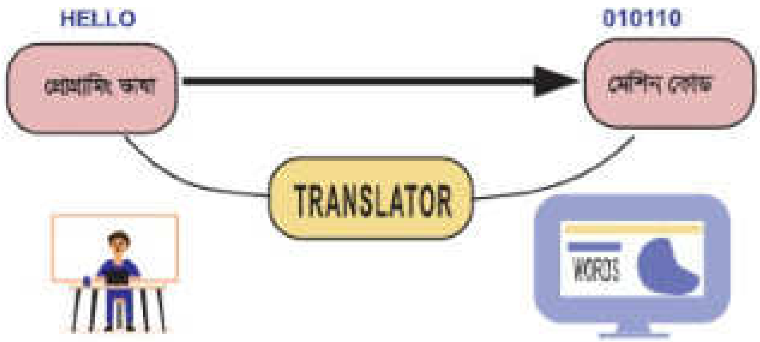

মেশিন কোড বা মেশিন ভাষা কি?

মূলত ০ আর ১ এর সমন্বয়ে তৈরি বাইনারি কোডকেই মেশিন কোড বা মেশিন ভাষা বলা হয়, যা আমাদের কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে। কাজেই প্রোগ্রামিং ভাষা ও মেশিন কোডের মধ্যে রূপান্তরের কাজটি অনুবাদক নামক এক ধরনের প্রোগ্রামের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। অনুবাদকের মাধ্যমে মেশিন কোডে রূপান্তরের ফলে আমাদের নির্দেশগুলো কম্পিউটার বুঝতে পারবে এবং সেই নির্দেশ অনুসরণ করে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

কম্পিউটারে থাকা প্রোগ্রামিং ভাষার রূপান্তর ব্যবস্থা বা অনুবাদক প্রোগ্রাম আবার দুই রকমের হতে পারে-

ক) কম্পাইলার (Compiler) : কিছু রূপান্তর ব্যবস্থায় আমরা যতগুলো নির্দেশ দিব, যদি নির্দেশগুলো নির্ভুল হয় তাহলে সবগুলো নির্দেশ একসাথে মেশিন কোডে রূপান্তরিত হবে। এই রূপান্তর ব্যবস্থাকে বলা হয় কম্পাইল (Compile) করা। আর যে সফটওয়্যার রূপান্তর করল, সেই রূপান্তরকারী প্রোগ্রামটি হচ্ছে একটি কম্পাইলার (Compiler)। তবে কম্পাইলার যদি পুরো নির্দেশের কোথাও ভুল পায়, তাহলে রূপান্তর করতে পারে না। সবগুলো নির্দেশ নির্ভুল দিলে তখনই রূপান্তরের কাজটি করতে পারে।

খ) ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) : কিছু রূপান্তর ব্যবস্থায় আমরা যত নির্দেশই দেই না কেন, সব একসাথে রূপান্তর হবে না। একটি একটি করে নির্দেশ ধারাবাহিকভাবে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এই রূপান্তরব্যবস্থাকে বলা হয় ইন্টারপ্রেট (Interpret) করা। আর যে রূপান্তরের কাজটি করছে তাকে বলা হয় ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)। ইন্টারপ্রেটার একটি একটি করে নির্দেশ রূপান্তর করতে থাকবে। কোনো নির্দেশে ভুল পেলে সেই নির্দেশে আসার পর থেমে যাবে।

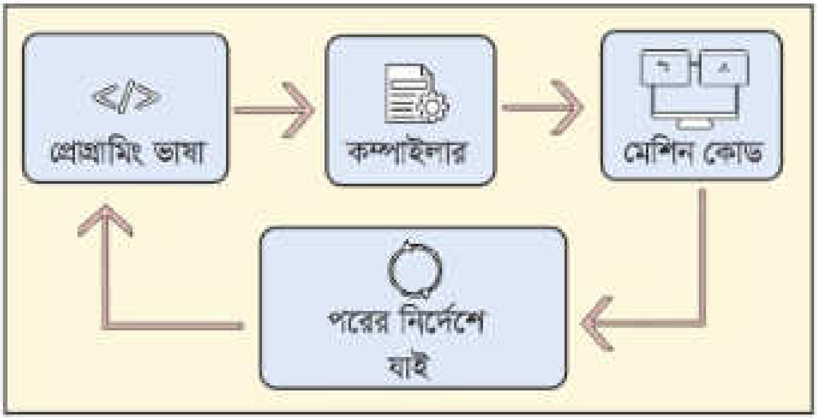

কোন প্রোগ্রামিং ভাষাটি শিখব?

বর্তমানে প্রচলিত প্রোগ্রামিং ভাষাগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটি প্রোগ্রামিং ভাষা প্রথমে শিখলেই হবে। কারণ সব প্রোগ্রামিং ভাষার মূল গঠন একই রকমের, শুধু ভাষাগুলোতে বিভিন্ন নির্দেশ লেখার নিয়মে একটু-আধটু ভিন্নতা থাকে। যেমন সি প্রোগ্রামিং ভাষায় প্রতিটি নির্দেশ (স্টেটমেন্ট) শেষ হবার পর একটি সেমিকোলন চিহ্ন দিতে হয়, কিন্তু পাইথনে এই কাজ করতে হয় না। এরকম কিছু পার্থক্য থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। তুমি একটি প্রোগ্রামিং ভাষা শিখে নিলে এরপর তোমার জন্য অন্য প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো শেখা খুবই সহজ হয়ে যাবে। তবে সাধারণভাবে প্রোগ্রামিং ভাষা পছন্দের বিষয়টি কাজের ধরন এবং কিছুটা আগ্রহের উপরও নির্ভর করে। প্রোগ্রামিং যারা নতুন শিখতে চায় তাদের জন্য পাইথন একটি দুর্দান্ত সূচনা হতে পারে।

সহজে শেখার জন্য পাইথন বেশ মজার একটি প্রোগ্রামিং ভাষা। এটি শিক্ষানবিস-বান্ধব, এর একটি সাধারণ সিনট্যাক্স রয়েছে এবং এটি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সায়েন্স এবং অটোমেশনের মতো ক্ষেত্রসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

পাইথনে প্রোগ্রামিংয়ের যাত্রা শুরু:

পাইথন ভাষার নির্দেশ বা কোড লেখার জন্য প্রথমে প্রোগ্রামিং পরিবেশ তৈরির জন্য কিছু কাজ করতে হবে-

১. পাইথন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড কে আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হবে। এই লিংকে থেকে পাইথন ডাউনলোড করা যায়।

https://www.python.org/downloads/

এরপর সেখান থেকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক ভার্সন নামিয়ে নেই।

২. অ্যাপ্লিকেশন নামানো হয়ে গেলে এটি ইনস্টল করে ফেলি। ইনস্টলের সময় নিচের ছবির মতো একটি উইন্ডো দেখতে পাব-

এখন ইনস্টল উইন্ডোর নিচে থাকা অপশনগুলো ক্লিক করে টিক চিহ্ন দিয়ে দিব। তারপর Install Now অপশনে ক্লিক করব। এ সময় ইনস্টল হবার অনুমতি চাইলে সেটাও অনুমতি দিয়ে দিব।

৩. এরপর আমাদের মেসেজ দেখাবে যে আমাদের সেটআপ সফল হয়েছে।

৪. পাইথন আমাদের কম্পিউটারে যুক্ত হলো। কিন্তু আমাদের আরেকটি সফটওয়্যার এপ্লিকেশন লাগবে যেখানে আমরা আমাদের নির্দেশ লিখে কম্পিউটারকে বুঝিয়ে দিব। সেজন্য এই লিংকে যাই-https://thonny-.org/ ; এই লিংক থেকে Thonny সফটওয়্যারটি নামিয়ে নেই ও ইনস্টল করে ফেলি।

৫. Thonny সফটওয়্যার এরপর চালু করি। নিচের মতো উইন্ডো দেখতে পাব-

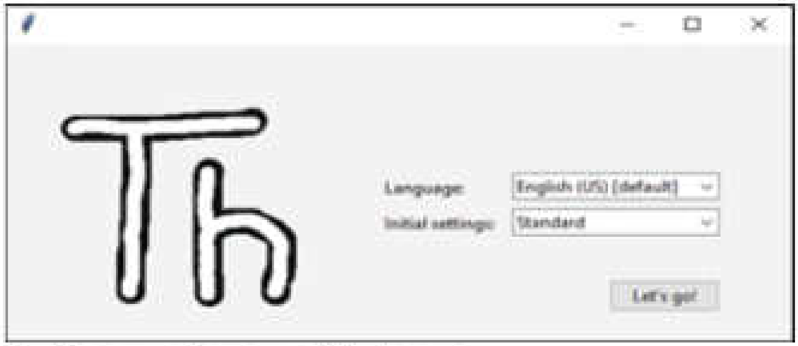

Let's go! বাটনে ক্লিক করলে নিচের মতো উইন্ডো আসবে-

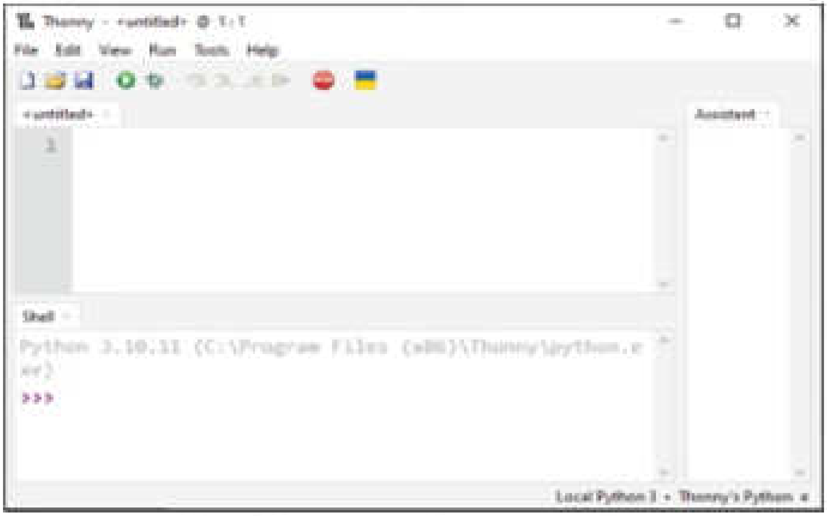

৬. এই উইন্ডোতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ বুঝে নেই-

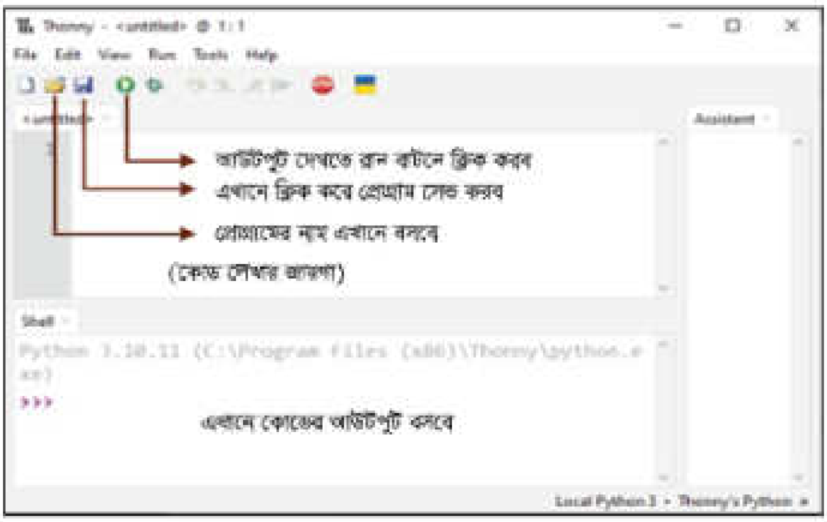

২০২৫

৭. এবারে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখি, যার কাজ হবে আউটপুট হিসেবে Hello World! প্রিন্ট করা। আউটপুট হিসেবে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে হলে print () ব্যবহার করতে হয়। আমরা যে টেক্সট প্রিন্ট ক তে চাই, সেটা print () এর ভিতরে Single Quotation (' ') দিয়ে তার মধ্যে লিখব। তাহলে Hello World! প্রিন্ট করতে লেখি-

print (' Hello World! ')

এরপর রান বাটনে ক্লিক করলে নিচে আউটপুট হিসেবে Hello World! লেখা উঠবে।

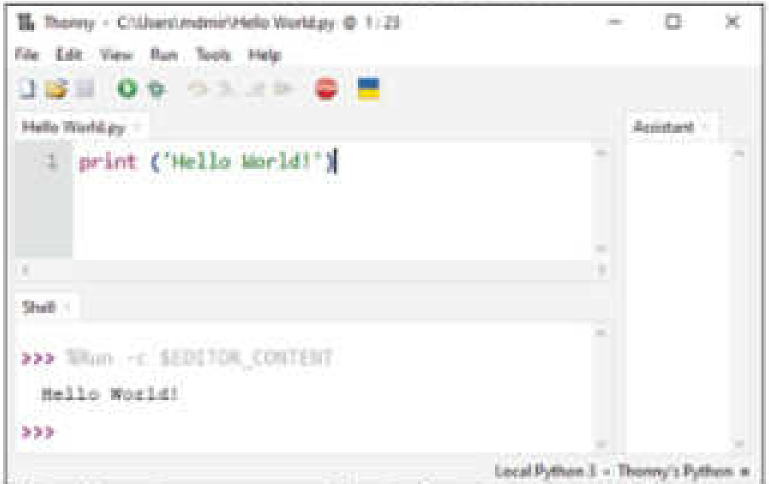

৮. এবারে সেভ বাটনে ক্লিক করে প্রোগ্রামের একটি নাম দিয়ে ফাইলটি সেভ করি। তখন আমাদের ফাইলের নামও প্রদর্শন করবে প্রোগ্রামের উপরে।

টেক্সট প্রদর্শন করা

আমরা যেমন ইংরেজি টেক্সট প্রিন্ট করলাম, একই ভাবে বাংলা লিখেও তুমি সেটা প্রিন্ট করতে পারবে। যেমন, নিচের লাইন লিখে রান করে দেখ তো কী দেখা যায়-

print (' আমি বাংলাদেশকে ভালবাসি ')

কাজেই print() ফাংশন মনিটরের স্ক্রিনে বা অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইসে নির্দিষ্ট বার্তা প্রিন্ট করে। বার্তাটি একটি স্ট্রিং বা অন্য কোনো বস্তু হতে পারে, স্ক্রিনে লেখার আগে অবজেক্টটি একটি স্ট্রিংয়ে রূপান্তরিত হবে।

প্রোগ্রামে চলক বা ভ্যারিয়েবলের ব্যবহার (Variable)

কোনো উপাত্ত বা ডেটা যদি প্রোগ্রামের ভিতর সঞ্চয় করতে হয় তাহলে আমরা চলক বা ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করতে পারব। চলক বা ভ্যারিয়েবল হলো একটি বক্সের মতো, যার ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো একটি ডেটা জমা রাখা যায়।

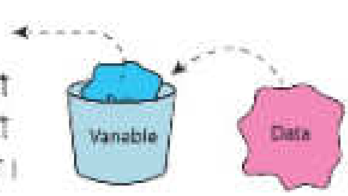

ভ্যারিয়েবল শব্দটির অর্থ পরিবর্তনশীল, এটি চলক নামেও পরিচিত। কাজেই আমরা চাইলে প্রোগ্রামে একটি লাইনে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে একটি ডেটা জমা রাখার পর অন্য লাইনে সেই ডেটা পরিবর্তন করে ভিন্ন আরেকটি ডেটা জমা রাখতে পারি। উল্লেখ্য পাইথন প্রোগ্রামে চলক বা ভরিয়েবলের কোনো নির্দিষ্ট ডেটা টাইপ ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই, এমনকি ডেটা টাইপ সেট করার পরেও যে কোনো সময় তা পরিবর্তন করা যায়।

চলক বা ভ্যারিয়েবলের নামকরণ

আমাদের সবার যেমন এক একটি নির্দিষ্ট নাম আছে এবং এই নাম দিয়ে আমরা একে অপরকে চিনতে পারি, ঠিক তেমনি প্রোগ্রামে প্রতিটি ভ্যারিয়েবলের একটি নির্দিষ্ট নাম দিতে হয়, যে নাম দিয়ে পুরো প্রোগ্রামে আমরা ভ্যারিয়েবলটি চিনতে পারব ও তা ব্যবহা করতে পারব। যেমন, আমরা যদি চাই number নামে একটি ভ্যারিয়েবল তৈরি করব, যেখানে ভ্যারিয়েবলের মান হিসেবে 9 জমা রাখতে চাই। তাহলে আমরা লিখব-

number=9

ভ্যারিয়েবলের নাম দেওয়ার সময় আমাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। যথা-

১। ভ্যারিয়েবলের নাম সবসময় একটি শব্দ হবে। অর্থাৎ একাধিক শব্দ দিয়ে আমরা ভ্যারিয়েবলের নাম লিখতে পারব না। তবে আমরা চাইলে দুটি শব্দের মধ্যে থাকা স্পেসগুলো বাদ দিয়ে তাদের একটি শব্দ হিসেবে ভ্যারিয়েবলের নাম দেওয়া যাবে। আবার চাইলে দুটি শব্দের মধ্যে থাকা স্পেস বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে একটি আন্ডারস্কোর (_) চিহ্ন দিয়েও ভ্যারিয়েবলটির নামকরণ করা যাবে।

২। ভ্যারিয়েবলের নামের প্রথম অক্ষর অবশ্যই a-z অথবা A-Z অথবা আন্ডারস্কোর (_) হতে হবে। প্রথম অক্ষর কোনো সংখ্যা (0-9) বা অন্য কোনো প্রতীক চিহ্ন (যেমন * বা - ইত্যাদি) হতে পারবে না। প্রথম অক্ষরের পর বাকি অক্ষরগুলোতে যেকোনো সংখ্যা (0-9) বা a-z অথবা A-Z অথবা আন্ডারস্কোর (_) ব্যবহার করা যাবে।

৩। ভ্যারিয়েবলের নামে অন্য কোনো প্রতীক চিহ্ন যেমন @, $, %, ^ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

৪। পাইথন একটি কেস সেনসেটিভ (Case Sensitive) প্রোগ্রামিং ভাষা। তাই একই অক্ষর ছোটো হাতের ও বড়ো হাতের হলে পাইথন তাদের দুটি ভিন্ন ভ্যারিয়েবল হিসেবে বিবেচনা করবে। যেমন, My_variable আর my_variable দুটি ভিন্ন ভ্যারিয়েবল হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫। কীওয়ার্ড হলো পাইথন প্রোগ্রামের সংরক্ষিত শব্দ। আমরা ভ্যারিয়েবলের নাম, ফাংশনের নাম বা অন্য কোনো শনাক্তকারী হিসেবে কীওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি না। পাইথন ৩.১০ তে ৩৫টি কী-ওয়ার্ড বা সংরক্ষিত শব্দ আছে। যেমন- False, True, None, and, as, break, class, continue, if, else, except, while, return, for, global ইত্যাদি।

ভ্যারিয়েবলের ভুল নামকরণ	ভ্যারিয়েবলের সঠিক নামকরণ
My Variable	MyVariable অথবা My_Variable
National ID	NationalID অথবা National_ID
this variable is cool	this_variable_is_cool
z!yan	zlyan অথবা z_yan
9abc	abc9
$variable	_variable
@My_name	My_name
print	কী ওয়ার্ডকে ভ্যারিয়েবলের নাম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে Myprint অথবা print1 সঠিক।

ভ্যারিয়েবলে ডেটা সংরক্ষণ করা অথবা ভ্যালু অ্যাসাইন করা

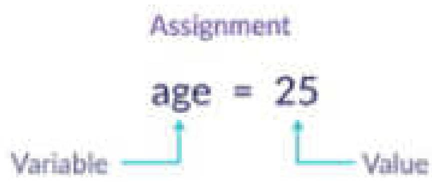

ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ডেটা জমা করার জন্য আমরা = চিহ্ন ব্যবহার করি। একে বলা হয় ভ্যালু অ্যাসাইন করা।

ধরি, আমাদের একটি ভ্যারিয়েবল আছে age। এখন age এর মান যদি 25 রাখতে চাই, তাহলে প্রোগ্রামে আমরা লিখব-

```
age=25
```

এই মানটি যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে লিখব,

```
print (age)
```

এবার আমরা যদি পাশের প্রোগ্রামটি লিখে রান করি,

```
age=25
print (age)
```

তাহলে আমরা চিত্রের মতো আউটপুট পাব।

আবার, পুরো প্রোগ্রামে একটি ভ্যারিয়েবলের মান একাধিকবার পরিবর্তন করা সম্ভব। ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নতুন মান অ্যাসাইন করা হলে আগের মান মুছে যায় ও সর্বশেষ অ্যাসাইন করা মানটি জমা থাকে।

নিচের প্রোগ্রামটি যদি রান করি, আউটপুট তাহলে কি হবে?

```
value_now=1
print(value_now)
value_now=2
print(value_now)
value_now=3
print(value_now)
```

এই প্রোগ্রামের আউটপুট নিচের ঘরে লিখে ফেলি-

```
1
2
3
```

লক্ষ্য করি, উপরের প্রোগ্রামে একই ভ্যারিয়েবল value_now কে আমরা বারবার প্রিন্ট করেছি। কিন্তু একেক সময়ে ভ্যারিয়েবলটির ভেতরে জমা থাকা ডেটা ভিন্ন ছিল, তাই প্রিন্ট করার পর ভিন্ন মান পেয়েছি।

ডেটাটাইপ (Data Type)

আমরা জানি, ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার প্রসেসরকে পূর্ণ সংখ্যা, ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা, বর্ণ, শব্দ, বুলিয়ান বা লজিক্যাল ডেটা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হয়। ডেটা টাইপ বলতে সাধারণত কোন ডেটা কম্পিউটার মেমরিতে কী পরিমাণ মেমরি (বিট বা বাইট) দখল করবে তা নির্ধারণ করা এবং প্রসেসর কীভাবে ডেটাকে প্রসেস করবে তা ব্যাখ্যা করাকে বুঝায়। পাইথন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের ডেটাটাইপ (Data Type) রয়েছে। নিচে কিছু ডেটা টাইপ উল্লেখ করা হলো।

নিচে কিছু ডেটা টাইপ উল্লেখ করা হলো।

ক) **int** : পূর্ণসংখ্যাকে ইংরেজিতে ইন্টিজার নাম্বার (Integer number) বলা হয়। তাই ভ্যারিয়েবলে পূর্ণসংখ্যা জমা রাখলে তার ডেটাটাইপকে বলা হয় int। এখানে int হলো integer এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এমন একটি উদাহরণ হলো-

EmpId_no = 5

খ) **float** : এই ভ্যারিয়েবলে আমরা ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা জমা রাখতে পারি। এমন সংখ্যাকে ইংরেজিতে floating number (ফ্লোটিং নাম্বার) বলা হয়। তাই ভ্যারিয়েবলে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা জমা রাখলে তার ডেটাটাইপকে বলা হয় float। এমন একটি উদাহরণ হলো-

Age=45.50

গ) **str**: ভ্যারিয়েবলে যদি কোনো টেক্সট বা অক্ষর জাতীয় তথ্য জমা রাখতে চাই, তাহলে সেটিকে string (স্ট্রিং) বলা হয়। আর এ ধরনের তথ্য str ডেটাটাইপের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে str হলো string এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আমরা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবলে যে টেক্সট রাখতে চাই তা Single Quotation এর মধ্যে জমা রাখব। উদাহরণ-

```
a=' c '
b=' This is a string variable '
```

ঘ) **bool**: bool হলো boolean এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কোনো ভ্যারিয়েবলে যদি সত্য (True) অথবা মিথ্যা (False) কে ডেটা হিসেবে জমা রাখতে হয়, তাহলে সেটি হবে বুলিয়ান (Boolean) ডেটা। এখানে bool ডেটাটাইপে দুটি মাত্র তথ্য রাখা যায়- True ও False। এমন উদাহরণ নিচে দেখি-

a=True

পাইথন প্রোগ্রামে int, float, str এবং bool ছাড়াও আরও কিছু ডেটাটাইপ আছে, যদি কখনো প্রোগ্রাম লেখার সময় প্রয়োজন হয় আমরা সেগুলো সম্পর্কে তখন জানতে পারব। ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা যে ডেটা জমা রাখি, সেটা জমা হয় কম্পিউটারের মেমোরিতে। তাই যখন আমরা প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করব, কম্পিউটার মেমোরিতে জমা থাকা ভ্যারিয়েবলটির মান তখন প্রোগ্রামে ব্যবহার হবে।

ডেটা টাইপের রূপান্তর : টাইপ কাস্টিং (Casting)

কোনো ভ্যারিয়েবলের ডেটাটাইপ কোনটি, সেটি সহজেই বের করা যায় type () এর মাধ্যমে। আমরা যদি একটি ভ্যারিয়েবলকে type () ফাংশনের ভিতরে রেখে প্রিন্ট করি, তাহলে ওই ভ্যারিয়েবলের ডেটাটাইপ পেয়ে যাব। যেমন নিচের প্রোগ্রামটি যদি রান করি,

```
test_variable = 73.07
print (test_variable)
print(type(test_variable))
```

আউটপুট পাব নিচের মতো-

```
73.07

<class ' float '>
```

অর্থাৎ, আমরা বুঝতে পারলাম test_variable নামক ভ্যারিয়েবলের কাছে জমা করা তথ্য 73.07 এবং এটি একটি float ডেটাটাইপের অন্তর্ভুক্ত ভ্যারিয়েবল।

প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে এমন সময় আসতে পারে যখন কোনো ভেরিয়েবলের ডেটা টাইপ পরিবর্তন করতে হয় অথবা সুনির্দিষ্ট করতে হয়। এটি কাস্টিং (casting) এর মাধ্যমে করা যেতে পারে। পাইথনে কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর (constructor) ফাংশন ব্যবহার করে তা করা হয়। ১০৮

নিচে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টাইপ কাস্টিং ফাংশন উল্লেখ করা হলো।

`int()` - ফ্লোট বা স্ট্রিং থেকে পূর্ণসংখ্যা তৈরি করে।

`float()` -স্ট্রিং, ফ্লোট বা পূর্ণসংখ্যা থেকে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা তৈরি করে।

`str()` -বিভিন্ন ধরনের ডেটা থেকে স্ট্রিং তৈরি করে।

এখন নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর।

x = int(1) # x এর মান হবে 1
y = int(2.8) # y এর মান হবে 2
z = int("3") # z এর মান হবে 3
	x = float(1) # x এর মান হবে 1.0
	y = float(2.8) # y এর মান হবে 2.8
	z = float("3") # z এর মান হবে 3.0
	w = float("4.2") # w এর মান হবে 4.2
		x = str("s1") # x এর মান হবে 's1'
		y = str(2) # y এর মান হবে '2'
		z = str(3.0) # z এর মান হবে '3.0'

প্রোগ্রামে ডেটা ইনপুট নেওয়া

আমরা যদি প্রোগ্রামের ব্যবহারকারীর নিকট থেকে ডেটা ইনপুট নিতে চাই তাহলে কি করব? input () ব্যবহার করে এই কাজটি করা খুবই সহজ। প্রোগ্রাম নির্বাহ করার সময় যখন input() ফাংশন আসে তখন প্রোগ্রাম এক্সিকিউটশন করা বন্ধ করে দেয় এবং ব্যবহারকারী কিছু ইনপুট দিলে তখন তা আবার চলতে থাকে। আমরা যদি নিচের মতো লেখি-

test_input=input ()

তাহলে test_input ভ্যারিয়েবলটি আমাদের নিকট থেকে একটি ইনপুট গ্রহণ করবে। তবে, input () প্রোগ্রামের ভিতরে ইনপুট হিসেবে কোনো সংখ্যা, অক্ষর ইত্যাদি যেটাই গ্রহণ করুক না কেন, সেটিকে স্ট্রিং (str) ডেটাটাইপে গ্রহণ করবে। এখন আমরা একটি ভ্যারিয়েবল ইনপুট নিয়ে সেটি প্রিন্ট করি।

```
test_input= input()
print(test_input)
print(type(test_input))
```

এই প্রোগ্রামের আউটপুট তাহলে কি হবে? তুমি যা ইনপুট দিবে সেটিই কিন্তু আউটপুট হিসেবে প্রিন্ট হবে। কিন্তু খেয়াল করে দেখ, তুমি কোনো পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ ইনপুট দিলেও সেটির ডেটাটাইপ হিসেবে str প্রিন্ট হচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যে তথ্যই জমা দাও, input () তথ্যটিকে একটি স্ট্রিং হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু তুমি যদি চাও ইনপুটটি যেন স্ট্রিং হিসেবে জমা না হয়ে ইন্টিজার বা ফ্লোট ডেটা হিসেবে জমা হয় তাহলে তোমাকে তথ্যটি ওই নির্দিষ্ট ডেটাটাইপে রূপান্তর করে নিতে হবে। নিচের মতো প্রোগ্রাম করে আমরা যখন কোনো তথ্য ইনপুট নিচ্ছি, input() ফাংশনকে সরাসরি int ডেটাটাইপে রূপান্তর করা যাবে-

```
test_input = int(input())
print(test_input)
print(type(test_input))
```

প্রোগ্রামটি রান করার পর খেয়াল করে দেখো int(input()) লেখার কারণে test_input ভ্যারিয়েবলটি int ডেটা টাইপে রূপান্তরিত হচ্ছে।

আবার, আমরা চাইলে একটি তথ্য ইনপুট নেবার সময় নির্দিষ্ট কমেন্ট বা নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারব। সেজন্য input() এর ভিতরে ' ' দিয়ে সেই কমান্ড লিখে দিতে পারি। যেমন, আমরা যদি লেখি-

```
test_input = intput('Provide a sentence as an input:')
print(test_input)
print(type(test_input))
```

তাহলে প্রোগ্রামটি রান করার পর প্রথমে আমাদের কাছে একটি ইনপুট কমান্ড প্রদর্শন করবে

Provide a sentence as an input

এখন আমরা যদি চাই, আমাদের ইনপুট নেওয়া তথ্য প্রিন্ট করার আগে ও পরে আরও শব্দ বা বাক্য প্রিন্ট করতে পারি। এজন্য যে শব্দ বা বাক্য প্রিন্ট করতে চাই, সেটি print() এর মধ্যে ' ' এর ভিতরে লিখব এবং তারপর , (কমা) চিহ্ন দিয়ে আমাদের ভ্যারিয়েবলের নাম লিখে দিব। যেমন-

```
test_input=int(input('Insert an integer number:'))

print('This is your integer number:', test_input)
```

তাহলে নিচের মতো আউটপুট দেখতে পাব-

Insert an integer number: 1245
This is your integer number: 1234

এখানে খেয়াল করে দেখো, print() এর মধ্যে যখন আমরা টেক্সট প্রিন্ট করছি, তখন সেটি ' ' বা একক উদ্ধৃতির ভিতরে লিখেছি। আর যখন আমরা একটি ভ্যারিয়েবল প্রিন্ট করেছি, সেটিকে কোনো ' ' বা একক উদ্ধৃতির মধ্যে না রেখে সরাসরি ভ্যারিয়েবলটির নাম লিখেছি।

গাণিতিক অপারেশন (Arithmetic Operation)

আমরা গাণিতিক অপারেশন (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও ভাগশেষ) করতে সহজেই নিচের অপারেটরগুলো ব্যবহার করতে পারি-

অপারেটর	কাজ
+	এটি যোগ (Addition) অপারেটর। এই অপারেটর ব্যবহার করে অপারেটরটির দুপাশে থাকা দুটি ভ্যারিয়েবলকে যোগফল বের করা যাবে।
-	এটি বিয়োগ (Subtraction) অপারেটর। এই অপারেটর ব্যবহার করে অপারেটরটির দুপাশে থাকা দুটি ভ্যারিয়বলের বিয়োগফল বের করা যাবে।
*	এটি গুণ (Multiplication) অপারেটর। এই অপারেটর ব্যবহার করে অপারেটরটির দুপাশে থাকা দুটি ভ্যারিয়েবলের গুণফল বের করা যাবে।
/	এটি ভাগ (Division) অপারেটর। এই অপারেটর ব্যবহার করে অপারেটরটির বামপাশে থাকা ভ্যারিয়বলকে ডানপাশে থাকা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফল বের করা যাবে।
%	এটি মডুলো (modulo) অপারেটর। এই অপারেটর ব্যবহার করে অপারেটরটির বামপাশে থাকা ভ্যারিয়েবলকে ডানপাশে থাকা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ বের করা যাবে।

ব্যবহারিক সমস্যা-১ : দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল প্রিন্ট করার জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করি।
সমাধান : দুটি পূর্ণসংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল প্রিন্ট করার প্রোগ্রামটি নিচে দেওয়া হলো-

```
num1 = int(input('Insert the first integer:'))
num2 = int(input('Insert the second integer:'))
result = num1+num2
print('The sum of', num1,'and', num2, 'is', result)
```

উপরের প্রোগ্রামটি রান করলে তুমি পছন্দমতো দুটি সংখ্যা ইনপুট দিতে পারবে এবং তারপর সংখ্যা দুটির যোগফল হিসাব করে নিচের মতো ফলাফল দেখাবে।

Insert the first integer: 50
Insert the second integer: 100
The sum of 50 and 100 is 150

উপরের প্রোগ্রামটি কিছু পরিবর্তন করে বিয়োগফল ও গুণফল ছাপানোর একটি প্রোগ্রাম তৈরি কর।

Comparison বা তুলনা করার অপারেটর এবং তাদের ব্যবহার-

রিলেশনাল অপারেটর	উদাহরণ	ব্যবহার
== (Equal)	Op1== 10 Op1== (Op2 + Op3)	ডান দিকের অপারেন্ড এবং বাম দিকের অপারেন্ড সমান হলে।
!= (Not Equal)	Op1 != 10 Op1 != (Op2 - Op3)	ডান দিকের অপারেন্ড এবং বাম দিকের অপারেন্ড অসমান হলে।
< (Less Than)	Op1<10 Op1< (Op2 - 10)	একাধিক অপারেন্ড-বিশিষ্ট গ্রুপ এক্সপ্রেশন তৈরির জন্য।
<= (Less or Equal	Op1 <= 10 Op1<= (Op2-Op3)	ডান দিকের অপারেন্ডের চেয়ে বাম দিকের অপারেন্ড ছোটো বা সমান হলে।
> (Greater Than)	Op1>10 Op1> (Op2 + Op3)	ডান দিকের অপারেন্ডের চেয়ে বাম দিকের অপারেন্ড বড়ো হলে।
>= (Greater or equal)	Op1>=10 Op1>= (+Op2+Op3)	ডান দিকের অপারেন্ডের চেয়ে বাম দিকের অপারেন্ড বড়ো, বা সমান হলে।

এখানে, Op1, Op2, Op3, যে কোন বৈধ ভেরিয়েবল। রিলেশনাল অপারেটরের সাথে এক বা একাধিক ভেরিয়েবল অথবা এ্যারেথমেটিক এক্সপ্রেশন সহযোগে রিলেশনাল এক্সপ্রেশন তৈরি করা হয়।

প্রোগ্রামে শর্তের ব্যবহার

আমরা কোন পরীক্ষার ফলাফল হিসাব করার একটি প্রোগ্রাম তৈরি করব। ধরা যাক ঐ পরীক্ষায় পাশের নম্বর হল ৪০। এখন যে ৪০ এর চেয়ে কম পাবে সে ফেল করবে এবং যে ৪০ বা তার চেয়ে বেশি পাবে সে পাশ করবে। কাজেই এখানে একটি শর্ত বিবেচনা করতে হবে এবং শর্তের উপর পাশ কিংবা ফেল নির্ভর করছে। পাইথন প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোন কার্য বা স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে "যদি" অর্থে if স্টেটমেন্টর ব্যবহার তুলনা করা যেতে পারে। if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরম্যাট হলো-

```
if condition:
    statement(s) to be executed if condition is true
statement just below if
```

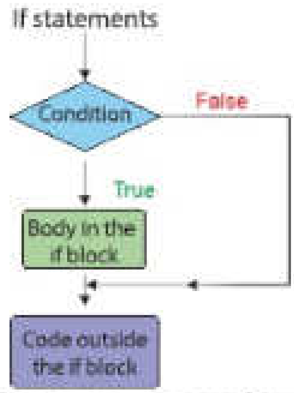

if স্টেটমেন্টে ব্যবহৃত শর্ত (condition) সাধারণত এক বা একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন হতে পারে যা if পরবর্তী লেখা হয়। if (condition) স্টেটমেন্টের পর কোলন থাকবে।

এই শর্তের মান যদি সত্য হয় তবে if পরবর্তী লাইনে বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদিত হবে। একে if এর বডি (Body) বা মূল অংশও বলা হয়। এখানে যে কোনো বৈধ সিম্পল বা কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট থাকতে পারে।

শর্তের মান যদি মিথ্যা হয় তবে if এর মূল অংশ বা if এর বডিতে প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ যাবে না। ফলে বডিতে বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদিত না হয়ে পরবর্তী স্টেটমেন্টসমূহ সম্পাদিত হবে।

ব্যবহারিক সমস্যা # ২ : কোন পরীক্ষায় পাশের সর্বনিম্ন নম্বর হচ্ছে ৪০। কোনো শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষায় ৪০ বা তার চেয়ে বেশি নম্বর অর্জন করে তবে পাশ অন্যথায় ফেল হিসেবে গণ্য করা হবে। শিক্ষার্থীর অর্জিত নম্বরকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে আউটপুট হিসেবে উক্ত শিক্ষার্থীর পাশ বা ফেলের সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
mark = int(input('Please enter your mark: '))
if mark >= 40:
    print('You have passed')
if mark < 40:
    print('You have failed')
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

```
Please enter your mark: 85
You have passed in the subject.
```

if...else স্টেটমেন্ট

পাইথন প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট বা কার্য সম্পাদনের জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। if স্টেটমেন্টের সাথে "অন্যথায়" অর্থে else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এজন্য এই স্টেটমেন্টকে if... else স্টেটমেন্ট বলা হয়। if... else স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরম্যাট হলো-

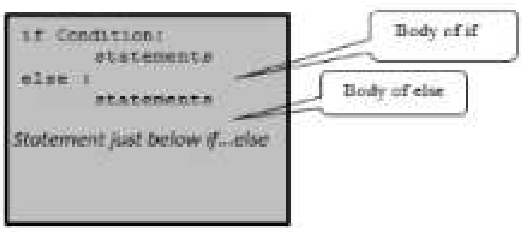

উল্লেখ্য যে, if...else কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত (Condition) সাধারণত এক বা একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন হয়। if (Condition) স্টেটমেন্টের পরে কোলন বসে।

এই Condition বা শর্তের মান যদি সত্য হয় তবে Body of if এ বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদিত হবে। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে Body of else এ বর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদিত হয়। এখানে statements এ যে কোন বৈধ সিম্পল বা কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট হতে পারে। চিত্রে if...else স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র দেখান হলো-

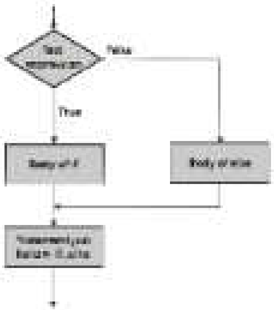

ব্যবহারিক সমস্যা # ৩ : পাইথন ভাষার একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে যাতে কোন নাগরিকের বয়স ইনপুট দেওয়া হলে তিনি নির্বাচনের ভোটার হওয়ার উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করবে।

সমাধান : ন বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক ১৮ বয়স হলেই নির্বাচনে ভোটার হিসাবে বিবেচিত হয়। নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
age = int(input('Please enter your age: '))
if age >= 18:
    print('You are eligible for voting')
else :
    print('You are not eligible for voting')
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ৪ : কোন সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা নির্ণয় করার জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
num = int(input('Insert a number= '))
if num%2!= 0:
    print('The number is odd')
else :
    print(' The number is even')
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

```
Insert a number = 67
The number is odd.
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ৫ : কোন বর্ষ অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান: কোনো বর্ষ লিপ ইয়ার (Leap year) কিনা তা জানতে হলে বর্ষ সংখ্যাটিকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করতে হয়, ভাগশেষ শূন্য হলে তা লিপ-ইয়ার, অন্যথায় বর্ষ সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করতে হয়, এবার যদি ভাগশেষ শূন্য হয় তবে তা লিপ ইয়ার নয় এবং যদি ভাগশেষ শূন্য না হয়, তবে বর্ষ সংখ্যাটিকে পুনরায় ৪ দিয়ে ভাগ করতে হয়। এক্ষণে ভাগশেষ শূন্য হলে বর্ষটি লিপইয়ার, নতুবা লিপ ইয়ার নয়।

```
year = int(input('Enter the year (4 Digit) to check :'))
if (year%400 == 0 or (year%100 != 0 and year %4 == 0)):
    print(year, 'is a leap year.')
else :
    print(year, 'is not a leap year.')
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

Enter the year (4 Digit) to check :2012
2012 is a leap year.

Enter the year (4 Digit) to check :1990
1990 is not a leap year.

ব্যবহারিক সমস্যা # ৬ : মিটার থেকে ফুট এবং ফুট থেকে মিটারে রূপান্তর করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখো।
সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
print('1:Feet to Meters, 2:Meters to Feet.')
choice = int(input('Enter Choice: '))
if choice == 1:
    num = float(input('Enter number of feet: '))
    print('Meters: ', round((num/3.28),3))
else :
    num = float(input('Enter number of meters: '))
    print ('Feet: ', round((num*3.28),3))
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল -

1:Feet to Meters, 2:Meters to =Feet. Enter Choice:1

Enter number of feet: 25

Meters: 7.622

1:Feet to Meters, 2:Meters to Feet.

Enter Choice: 2

Enter number of Meters: 60

Feet : 196.800

একাধিক শর্ত যাচাই করার জন্য পাইথন প্রোগ্রামে "অন্যথায় যদি" অর্থে if...else স্টেটমেন্টের সাথে স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। elif স্টেটমেন্ট else এবং if এর মাঝে থাকে। প্রোগ্রামে একাধিক if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে elif স্টেটমেন্ট জনপ্রিয়। অর্থাৎ প্রোগ্রামে একাধিক শর্ত যাচাই করার জন্য elif ব্যবহৃত হয়। স্টেটমেন্ট ব্যবহারের ফরম্যাট হলো-

```
if (Conditional):
       Block1
elif (Conditional2):
       Block2
... ... ...
else :
       DefaultBlock;

BlockN;
... ... ...
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ৭ : প্রদত্ত কোনো সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক না শূন্য তা নির্ণয় করার জন্যএকটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
num = int(input('Insert a number: '))
if num > 0:
    print('The number is positive')
elif num < 0:
    print('The number is negative')
else :
    print('It is zero')
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

Insert a number : 7
The number is positive.

match স্টেটমেন্ট

পাইথন প্রোগ্রামে elif স্টেটমেন্টের অনুরূপ কাজে অর্থাৎ একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট কোনো স্টেটমেন্ট নির্বাহের জন্য match স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। মূলত বেশি সংখ্যক elif স্টেটমেন্ট ব্যবহারের পরিবর্তে match স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। match স্টেটমেন্টের সাথে অতিরিক্ত case ও break স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হতে পারে। elif স্টেটমেন্টে কোনো কন্ডিশনাল কিংবা রিলেশনাল এক্সপ্রেশনের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত স্টেটমেন্ট নির্বাচন করা হয়। কিন্তু match স্টেটমেন্টে সাধারণত কোনো বৈধ ভেরিয়েবলের মানের ভিত্তিতে উপযুক্ত স্টেটমেন্ট নির্বাচন করা হয়। match স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো-

```
match MatchExp:
        case Value1 :
                Block1
        case Value2 :
                Block2
        case Value3 :
                Block3
        case _ :
                DefaultBlock
BlockN
... ... ...
```

এখানে, match স্টেটমেন্টের সাথে ব্যবহৃত এক্সপ্রেশনকে ম্যাচ এক্সপ্রেশন (matchExp) বলা হয়। case স্টেটমেন্টে ম্যাচ এক্সপ্রেশন (matchExp) ভেরিয়েবলের সম্ভাব্য মান দেওয়া হয়। case কীওয়ার্ড ও ম্যাচ এক্সপ্রেশন ভেরিয়েবলের সম্ভাব্য মানের মাঝে ন্যূনতম একটি স্পেস থাকে এবং কোলন দ্বারা শেষ হয়। case স্টেটমেন্টে শেষে সাধারণত একটি default স্টেটমেন্ট থাকে যাকে কোলন দ্বারা শেষ হয়।

ব্যবহারিক সমস্যা # ৮ : ইংরেজি ছোটো হাতের কোনো অক্ষর vowel না consonants তা জানার জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান: ইনপুট হিসাবে ইংরেজি ছোটো হাতের কোনো অক্ষর টাইপ করা হবে। নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
char = input('Enter the letter: ')
match char:
        case "a" :
                print(char, ' is a vowel ')
        case "e" :
                print(char, ' is a vowel ')
        case "i" :
                print(char, ' is a vowel ')
        case "o" :
                print(char, ' is a vowel ')
        case "u" :
                print(char, ' is a vowel ')
        case _:
print(char, ' is a consonants')
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

Enter the letter: a
a is a vowel
Enter the letter: d
d is a consonants

বিকল্প পদ্ধতির সমাধান: উপরের প্রোগ্রামটিকে ইনপুট হিসেবে শুধুমাত্র ইংরেজি ছোটো হাতের কোনো অক্ষর টাইপ করা হলে ফলাফল দেখাবে। নিচের প্রোগ্রামটিতে ইংরেজি ছোটো হাতের বা বড়ো হাতের যে কোনো অক্ষর টাইপ করা হলে ফলাফল দেখাবে। নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
char = input('Enter the letter: ')
vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U']
if char in vowels:
    print(char, ' is a vowel')
else :
    print(char, ' is a consonants')
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ৯ : তিনটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্য থেকে বড় সংখ্যাটি বের করার জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
num1 = int(input('Enter integer number 1: '))
num2 = int(input('Enter integer number 2: '))
num3 = int(input('Enter integer number 3: '))
if (num1 >= num2) and (num1 >= num3):
    print(num1, 'is the largest number')
elif (num2 >= num1) and (num2 >= num3):
    print(num2, 'is the largest number')
else :
    print(num3, 'is the largest number')
```

২০২৫

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল

```
Enter integer number 1: 10
Enter integer number 2: 20
Enter integer number 3: 30
30 is the largest number.
```

একই কাজ বার বার করা : প্রোগ্রামে লুপের ব্যবহার

আমাদের জীবনে আমরা যেমন কিছু কাজ বার বার করি তেমনি প্রোগ্রামেও কিছু কাজ বার বার করতে হয়। প্রোগ্রামে একই কাজ একাধিক বার সম্পন্ন করতে হলে লুপ (Loop) ব্যবহার করতে হয়। স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিক বার সম্পাদনের জন্য লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। পাইথন প্রোগ্রামে লুপ নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত অন্যতম লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্টসমূহ হলো-

for স্টেটমেন্ট
while স্টেটমেন্ট
continue, break ও pass স্টেটমেন্ট।

নিম্নে বিভিন্ন স্টেটমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

for লুপ স্টেটমেন্ট

পাইথন প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিক বার সম্পাদন করার জন্য for স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। লুপ কতবার নির্বাহ করা হবে তা জানা থাকলেই কেবলমাত্র for লুপ ব্যবহার উপযোগী। সাধারণত কোনো ভেরিয়েবল ব্যবহার করে for লুপের আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়। এরূপ ভেরিয়েবলকে কাউন্টার ভেরিয়েবল বলা হয়। নিম্নে for স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো-

```
for CounterInitialization in Condition :

        // Statement(s)
```

CounterInitialization অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মান দেওয়া হয়, একে Initialization বা লুপের শুরু বলা হয়। Condition অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের চূড়ান্ত মান কিংবা চূড়ান্ত মান নির্ধারণের শর্ত দেওয়া হয়। কাউন্টার ভেরিয়েবল চূড়ান্ত মানে না পৌঁছা পর্যন্ত কিংবা শর্ত সত্য থাকা পর্যন্ত for লুপের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেটমেন্ট সম্পাদিত হতে থাকে।

ব্যবহারিক সমস্যা # ১০ : একটি নির্দিষ্ট টেক্সটকে একাধিকবার প্রদর্শনের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান : ধরা যাক, ICT টেক্সটি ৫ বার প্রদর্শন করা হবে।

```
for i in range(1,6):
    print('ICT')
```

বিকল্প পদ্ধতির সমাধান ১: (Increment by 1)

```
for i in range(1,6,1):
    print('ICT')
```

বিকল্প পদ্ধতির সমাধান ২: (Decrement by 1)

```
for i in range(6,1,-1):
    print('ICT')
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

```
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ১১ : একটি প্রোগ্রাম লিখ যা কোনো শব্দ ৫০ বার দেখাবে।

সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
var = input(('Write a word: '))
for i in range(1,51):
    print(var)
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল-

```
Write a word: Computer
Computer    Computer    Computer    Computer    Computer
Computer    Computer    Computer    Computer    Computer
-           -           -           -           -
Computer    Computer    Computer    Computer    Computer
Computer    Computer    Computer    Computer    Computer
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ১২ : ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে বিজোড় সংখ্যাগুলো বের করার একটি প্রোগ্রাম লিখ।

সমাধান: নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
for i in range(1, 101):
    if (i % 2 != 0):
        print(i)
```

প্রোগ্রামটি রান করলে নিচের ফলাফল প্রদর্শিত হবে-

```
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ১৩ : একটি প্রোগ্রাম লিখ যা নিম্নের ন্যায় ফলাফল দেখাবে।

```
1
12
123
1234
.
.
.
123456789
```

সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end=" ")
    print()
```

২০২৫

প্রোগ্রামটি রান করলে নিচের নমুনা ফলাফল প্রদর্শিত হবে-

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

ব্যবহারিক সমস্যা # ১৪ : কোনো একটি সংখ্যার নামতা বা গুণের টেবিল নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান : নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
num = int(input('Enter a number: '))
for i in range(1,11):
    prod = num*i
    print(num, '*', i, '=', prod)
```

প্রোগ্রামটি রান করে নিচের নমুনা ডেটা ইনপুট দিলে ফলাফল প্রদর্শিত হবে-
Enter a number : 3

```
3*1=3
3*2=6
3*3=9
3*4=12
3*5=15
3*6=18
3*7=21
3*8=24
3*9=27
3*10=30
```

একটি for লুপ স্টেটমেন্টের মধ্যে অন্য কোন কোন for স্টেটমেন্ট থাকতে পারে। এরূপ for লুপকে নেস্টেড for লুপ এবং মাধ্যবর্তী for লুপকে ইনার (Inner) for লুপ, বহিস্থ for লুপকে আউটার (Outer) for লুপ বলা হয়। আউটার লুপের পূর্বে ইনার for লুপের কাজ শেষ হয়।

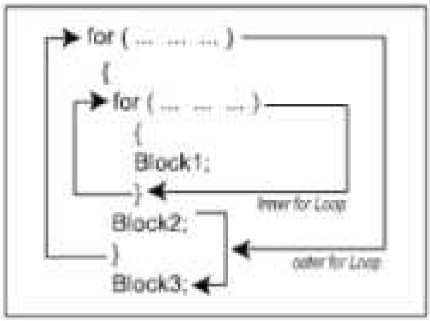

while লুপ

পাইথন প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে দুই বা ততোধিক বার কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদন করার জন্য while লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এই লুপের শুরুতেই শর্ত পরীক্ষা করা হয়।

প্রদত্ত শর্ত সত্য অথবা অশূন্য (Non Zero) হলেই কেবল লুপ নির্বাহ হবে; অন্যথায় লুপ থেকে বের হয়ে যাবে। কোনো স্টেটমেন্ট নির্বাহ করবে না। নিম্নে while লুপ নিয়ন্ত্রণের ফরম্যাট দেওয়া হলো-

```
CounterInitialization;
while Condition:
        // Statement(s)
CounterDecrement/Increment;
```

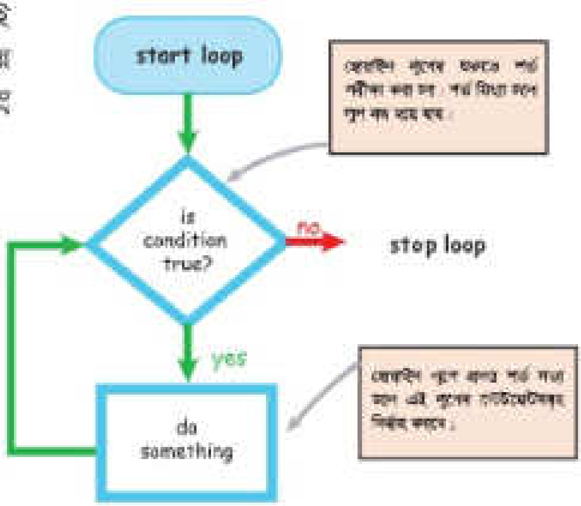

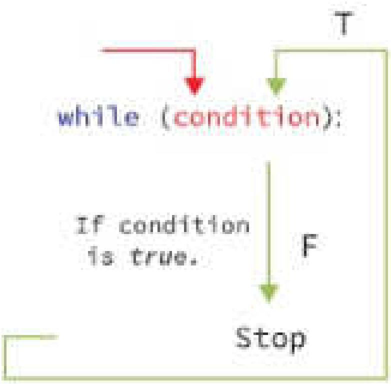

CounterInitialization অংশে উপযুক্ত ডেটা টাইপসহ কাউন্টার প্রারম্ভিক মান নির্ধারণ করা হয়। Condition অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের চূড়ান্ত মান কিংবা চূড়ান্ত মান নির্ধারণের জন্য শর্ত দেওয়া হয় এবং CounterDecrement/Increment অংশে প্রতিবার আবর্তন কালে কাউন্টার ভেরিয়েবলের হ্রাস/বৃদ্ধির মান নির্ধারণ করা হয়। Condition সত্য থাকা পর্যন্ত while লুপের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেটমেন্ট নির্বাহিত হতে থাকে। যখনই শর্ত মিথ্যা হয়ে যায় তখনই লুপ থেকে বের হয়ে যায়।

while লুপের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেটমেন্ট সাধারণত কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট হয়ে থাকে। প্রয়োজনে একটি while লুপের মধ্যে অপর কোনো while লুপ বা for লুপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এরূপ মধ্যবর্তী while লুপকে নেস্টেড while লুপ বলা হয়।

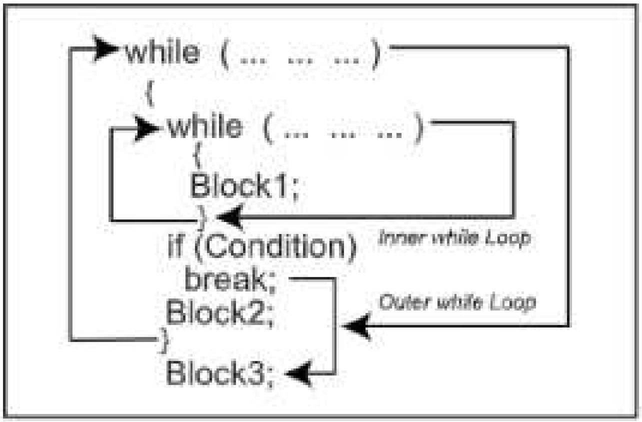

নেস্টেড while স্টেটমেন্টের প্রবাহচিত্র

while লুপ অনেকটা for স্টেটমেন্ট বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। for স্টেটমেন্টের মত পূর্বে ঘোষিত কোনো কাউন্টার ভেরিয়েবল ব্যবহার করে স্টেটমেন্টের আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়।

ব্যবহারিক সমস্যা # ১৫ : হোয়াইল লুপ ব্যবহার করে ICT লেখাটিকে একাধিকবার প্রদর্শনের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখো।

সমাধান : ধরা যাক, ICT টেক্সটি ৩ বার প্রদর্শন করা হবে।

```
count=1
while (count<=3):
    print('ICT')
    count=count+1
```

প্রোগ্রামটি রান করে প্রাপ্ত নমুনা ফলাফল

```
ICT
ICT
ICT
```

নিচে while লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত এবং ১ থেকে *n* (যেখানে *n* হলো কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা) পর্যন্ত ধারার যোগফল নির্ণয়ের দুটি প্রোগ্রাম দেওয়া হলো।

ব্যবহারিক সমস্যা # ১৬ : ১+২+৩+৪+.............+১০০ ধারার যোগফল নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লিখ।

অথবা, ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল ধনাত্মক সখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখ।

সমাধান: নিচে প্রোগ্রামটির কোড দেওয়া হলো।

```
sum=0
count=1
while (count<=100):
     sum = sum + count
     count=count+1
print('The sum of the value is ', sum)
```

প্রোগ্রামটি রান করে নিচের ফলাফল প্রদর্শিত হবে-

The sum of the value is 5050

continue স্টেটমেন্ট

পাইথন প্রোগ্রামে শর্তযুক্ত অথবা শর্তবিহীনভাবে কোনো স্টেটমেন্ট বা লুপের পুনরাবৃত্তি করার জন্যcontinue স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। continue স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো-

```
continue
```

continue স্টেটমেন্ট প্রোগ্রাম পয়েন্টারকে পূর্ববর্তী স্টেটমেন্ট বা লুপের প্রারম্ভে স্থানান্তর করে। continue স্টেটমেন্ট if, elif, for, while ইত্যাদি ছাড়া সরাসরি কাজ করতে পারে না। এ জন্য সাধারণত if, elif স্টেটমেন্টের সাথে সম্পর্কিত শর্ত সাপেক্ষে কোন লুপের পুনরাবৃত্তি করার জন্য continue স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। সে ক্ষেত্রে শর্তের মান সত্য হলে continue স্টেটমেন্ট কার্যকরী হয়, অন্যথায় কম্পাইলার continue স্টেটমেন্ট উপেক্ষা করে পরবর্তী স্টেটমেন্ট নির্বাহ করে।

continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের মধ্য থেকে যে কোনো একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সংখ্যাসমূহ প্রদর্শনের একটি প্রোগ্রাম নিচে দেওয়া হলো।

ব্যবহারিক সমস্যা # ১৭ : ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের মধ্য থেকে যে কোনো একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সংখ্যাসমূহ প্রদর্শনের জন্য একটি প্রোগ্রাম লিখ।

সমাধান : ধরা যাক, বাদ দেওয়া সংখ্যাটি হচ্ছে 8। প্রোগ্রামটি নিচে দেওয়া হলো-

```
for num in range(1, 11, 1):
    if num == 4:
        continue
    else:
        print(num, end=" ")
print('Used continue to skip printing the value 4')
```

প্রোগ্রামটি রান করলে নিচের ফলাফল প্রদর্শিত হবে–

1 2 3 5 7 8 9 10

Used continue to skip printing the value 4

break স্টেটমেন্ট

পাইথন প্রোগ্রামে লুপের মধ্যে break স্টেটমেন্ট পেলে লুপ সেখানে তার কাজ শেষ করে লুপ থেকে বের হয়ে যাবে। অনেকটা চলন্ত গাড়িতে ব্রেক কষলে যেমন গাড়ির চলা থেমে যায় তেমনি লুপের মধ্যে break স্টেটমেন্ট পেলে লুপ নির্বাহ বন্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই break স্টেটমেন্ট if, elif ইত্যাদির সাথে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

১। অনুবাদকের কাজ হলো-

i) সবগুলো নির্দেশ একসাথে মেশিন কোডে রূপান্তরিত করা।

ii) একটি একটি করে নির্দেশ মেশিন কোডে রূপান্তরিত করা।

iii) মেশিন কোডকে পাইথন কোডে রূপান্তরিত করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। পাইথন ভাষায় মনিটরে কোন লেখা প্রদর্শন করার জন্য নিচের কোন ফাংশনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. printf() খ. print()

গ. print ঘ. println()

৩। নিচের কোনটি পাইথন ভাষায় ভেরিয়েবলের সঠিক নাম?

ক. 9abc খ. $variable

গ. print ঘ. National_ID

৪। পাইথন ভাষায় y = int(2.8) হলে print (y) এর মান কত হবে?

ক. ২.৮ খ. ২

গ. ২৮ ঘ. ২.০

৫। পাইথন ভাষায়, a=5, b=2, y = a%b হলে print (y) এর মান কত হবে?

ক. ১ খ. ২

গ. ৩ ঘ. ৫

৬। নিচের পাইথন কোডটি লক্ষ্য কর।

```
for i in range(1,6):
print('ICT')
```

এখানে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক. ১ খ. ৫

গ. ৩ ঘ. ৬

৭। মেশিন কোড কী? প্রোগ্রাম কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তরের উপায় লিখ।

৮। কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর ফাংশন বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি ফাংশনের নাম লিখ।

৯। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল ধনাত্মক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য for লুপ ও while লুপ ব্যবহার করে দুটি প্রোগ্রাম লিখ। প্রোগ্রামদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক তা বিশ্লেষণ কর।

১০। break ও continue স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বড় হতে হলে সময়ের মূল্য দিতে হবে।
– চার্লস ডিকেন্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।